অবন্ধনা

ও

লালু

[মাক্সিম গর্কি বিরচিত মালভা এবং

রেড গল্পের মর্ম্মানুবাদ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ৩৲ টাকা

প্রিণ্টার
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ
৯৩/এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-রসিক বন্ধু

শ্রীহরিকেশব ঘোষ

প্রিয়বরেষু

কলিকাতা
পৌষ, ১৩৫৭

ম্যাক্সিম গর্কি

আলেক্‌সি মাক্সিমোভিচ পেশকভের জন্ম,—নিজনি-নভগরদে, ১৮৬৯ সালের ১৪ মার্চ্চ তারিখে। জন্ম অতি-সাধারণ গরীবের ঘরে। বাপ এক ফার্নিচারের দোকানে সামান্য চাকরি করতেন—মাতামহ কাপড় রঙ করতেন। ছোট বয়সেই পেশকভের মা-বাপ মারা যান; ঠাকুর্দ্দার হাতে পড়ে তাঁর লালন-ভার। ঠাকুর্দ্দার মন ছিল পাথরের মতো। স্নেহ-মায়া-মমতার বাষ্পও ছিল না সে-মনে। শাসনে-পীড়নে এমন তাঁর পটুতা যে ছোট বয়সে পেশকভের বাবা সে কড়া-শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

নাতির উপরেও মন ঠিক তেমনি কঠিন। পেশকভকে কাছাকাছি একটা স্কুলে তিনি ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন। পাঁচ মাস স্কুলে পড়বার পর পেশকভের হলো দুরন্ত বসন্ত রোগ। ঠাকুর্দ্দা তখন সেই যে তাঁকে স্কুল ছাড়ালেন, তারপর স্কুলে দেবার নাম আর কখনো করেননি! বসন্ত সারতে পেশকভকে ঠাকুর্দ্দা এক জুতোওয়ালার দোকানে ছোকরা-পিয়নের চাকরিতে ঢোকান—পেশকভের বয়স তখন ন বছর মাত্র। জুতোর দোকানে চাকরি করতে গিয়ে পেশকভের হাত পুড়ে গেল। মনিব তাঁকে বিদায় দিলে। ঠাকুর্দ্দার তর সইলো না—তিনি তখন তাঁকে এক ড্রাফটসম্যানের কাছে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। পেশকভের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সে চাকরি ছেড়ে ঠাকুর্দ্দার আশ্রয় ছেড়ে তিনি ভলগার এক ষ্টীমারে বাবুর্চির এ্যাসিষ্টাণ্টের চাকরি খুঁজে নিলেন। এ চাকরির দৌলতে বাড়ীতে থাকতে হবে না, ষ্টীমারে থাকবেন—পেট ভরে খেতে পাবেন।

এই চাকরিই তাঁর জীবনে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে। বাবুর্চি কিছু পড়াশুনা জানতো, বই পড়ার খুব ঝোঁক তার— ছোটখাট একটি লাইব্রেরী সে জমিয়ে তুলে ছিল। এখানে চাকরি করতে এসে বাবুর্চির বইগুলি নিয়ে পেশকভ পড়তে লাগলেন। বাবুর্চি নিজে থেকে তাঁকে বই পড়তে দিত। এখানে বই পড়তে-পড়তে পেশকভের মনে সাহিত্যানুরাগের সঞ্চার!

বাবুর্চির লাইব্রেরীতে ছিল পেশকভের লেখা বই। আর রাড-ক্লিফের বইয়ের অনুবাদঃ চার ওয়েসকির সম্পাদিত সোভরে-সিমিকের একখণ্ড গ্রন্থাবলী; খানকতক রাশিয়ান বই; ডুমার লেখা খানকতক উপন্যাস আর স্রীমেশনভের কতকগুলো পুস্তিকা। এই বইগুলি পেশকভ বার-বার পড়তেন। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। পড়ার ঝোঁক প্রবল হলো। তিনি স্থির করলেন, ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হবে, ডিগ্রী পাশ করবেন, করে তার পর নিজে বই লিখবেন।

ষ্টীমারের চাকরি তিনি ছেড়ে দিলেন। চাকরি ছেড়ে কাজানে এলেন। শুনলেন, বিনা-মাহিনায় সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থার সুযোগ নেবেন সঙ্কল্প করে পেশকভ এক রুটীর দোকানে চাকরি নিলেন--মাসে ছ শিলিং মাহিনা। এখানে থাকতে থাকতে শুনলেন নুনের খনিতে যারা কাজ করে, তাদের খাটুনির বহর অমানুষিক। এ খনির বর্ণনা তিনি তাঁর "আউটকাষ্ট" গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখানে তিনি বাস করতেন ছন্নছাড়া সমাজে যত অন্ত্যজ-ইতর লোকের সঙ্গে। জীবিকার জন্য কাঠ কেটেছেন, মোট পর্য্যন্ত বয়েছেন!

কাজানে ক'বছর থাকবার পর তিনি আসেন জারিজিনে। জারিজিনে রেল লাইনে তিনি সিগনালারের কাজ করেন।

কুড়ি বছর বয়সে বাধ্যতা-মূলক মিলিটারী ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকার দরুণ তাঁকে নিজনি-নভগরদে আসতে হলো। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, বলে তাঁকে মিলিটারী শিক্ষালয়ে নেওয়া হলো না। তখন পথে পথে ধেনো-মদ বেচে তাঁকে জীবিকার্জ্জন করতে হয়েছে—বহুদিন এ কাজ করবার পর চাকরি পেলেন এক উকিলের কাছে; মুহুরির কাজ। উকিলের নাম লানিন। কিশোর মুহুরির কাজে নিষ্ঠা আর লেখাপড়ায় অনুরাগ দেখে লানিন মুগ্ধ হলেন। তিনি পেশকভের শিক্ষা দীক্ষার সুবিধা করে দিলেন। লানিনের স্নেহে এবং দরদ-মমতায় পেশকভের আর্থিক দুর্দ্দশা ঘুচলো এবং এক তরুণ সাহিত্যসেবীকে তিনি পেলেন বন্ধু, আর সাথী। এ সাহিত্যিকের নাম ফেদারফ। এ সময় পেশকভ মাঝে মাঝে কিছু লিখছিলেন। সে সব লেখা দেখে ফেদারফ তাঁর প্রতিভার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ করেন। ফেদারফের উৎসাহে পেশকভ সাহিত্য-সেবায় কায়-মন সমর্পণ করলেন।

চেয়ারে বসে কেরাণীর চাকরি আর ভালো লাগছিল না। তাঁর ধাতে এ চাকরি কেমন খাপ খায় না! চাকরির মায়া কাটিয়ে তিনি যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করলেন। কোথাও আস্তানা পাতা নয়; শুধু ঘুরে বেড়ানো। উদরান্নের সংস্থানের জন্য যেটুকু কাজ পান, সেইটুকু করেন। এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন দক্ষিণ রাশ্যায়।

দক্ষিণ-রাশ্যায় জীবিকা-সংস্থানের জন্য কী কাজই না করেছেন! কখনো করাতী-মিস্ত্রীর কাজ…কখনো ষ্টেভাডোরের অফিসে মাল-খালাসী কেরাণীর কাজ। তারপর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে টিফ্‌লিশের রেলওয়ে-ওয়ার্কশপে মিস্ত্রীর চাকরিতে ঢোকেন। এই সময়ে তিনি লিখলেন প্রথম গল্প—মাকার শূদ্রা। গল্পটি ওখানকার

এক মাসিক পত্রে ছাপা হয়। এর পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লেখেন চেলকাশ গল্প। এ গল্প বিশ্ব-সাহিত্যে অমর আসন লাভ করেছে।

রচনা তিনি প্রকাশ করেছেন মাক্সিম গর্কি—এই ছদ্ম-নামে। এ-নাম নেবার অর্থ আছে। গর্কি কথার অর্থ হলো Bitter...তিক্ত-কষায়। দিকে দিকে যে তিক্ততা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই তিক্ততাকেই তিনি অপরূপ করে বিশ্বের ভাণ্ডারে দান করে গেছেন!

বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক সন্দর্ভ লিখে গর্কি বিশ্বের সাহিত্য সমালঙ্কৃত করে গেছেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য"—এই তত্ত্বই তিনি সব রচনায় প্রদীপ্ত প্রতিভায় ব্যঞ্জিত করেছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গর্কির মৃত্যু হয়। গর্কির সম্বন্ধে এক বিশিষ্ট সমালোচক খুব খাঁটী কথা লিখেচেন। তিনি লিখেচেন—

Gorky is bigger than he wants to be and than he always wanted to be.... if there exists to that great, boundless, spacious, melancholy and felicitious something which we are accustomed to combine under the name of 'Russ', then we have to recognise Gorky as the man who expresses all this to a very high degree.

আমরা কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা বলি·· মহাকবি সেক্সপীয়রের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন—গর্কির সম্বন্ধে আমরা সে কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলি—জগতের তুমি!

[illegible]

অপার অতল সাগর……

হালকা বাতাসে সাগরের বুক দুলে দুলে উঠছে…সে-দোলায় লক্ষ লক্ষ ঢেউ ফুটছে তার বুকে! মাথার উপর আকাশে জ্বলন্ত সূর্য্য… সূর্য্যের প্রখর কিরণে ঢেউগুলো ঝকঝক করছে।…প্রত্যেকটি ঢেউয়ের মুখে হাসির শুভ্র উচ্ছ্বাস! হাসির সে উচ্ছ্বাস-গুঞ্জনে সমুদ্রের বুক থেকে ঊর্দ্ধ আকাশ…আপ্রান্ত মুখর হয়ে আছে। আনন্দের কূজন তুলে ঢেউগুলো গায়ে গায়ে মিশে গড়িয়ে লুটিয়ে গিয়ে পড়ছে বালুর ঢালু তটে…তটের পা ছুঁয়ে আবার ফিরে ফিরে আসছে…এসে সাগরের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে একাকার হয়ে। সাগরের সঙ্গে সূর্য্য যেন খেলায় মেতেছে! কিরণের অজস্র ধারায় সাগরের নীলিমাকে সূর্য্য যেমন দীপ্ত শুভ্র করে তুলছে, সাগরও তেমনি সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে সূর্য্যের লক্ষ ছবি এঁকে চলেছে!

সাগরের এক-দিকার তীর-ভূমি…এ ধারটায় জেলেরা থাকে। সরকারকে টাকা দিয়ে লাইসেন্স নেয়…লাইসেন্স নিয়ে এ-দিকটায় তারা মাছ ধরে। বিনা-লাইসেন্সে মাছ ধরবার নিয়ম নেই; ধরলে সাজার ব্যবস্থা। মাছ-ধরার লাইসেন্সের জন্য টাকা জমা দিতে হয় সরকারী অফিসে। সে-অফিস দূরের বাঁক ছাড়িয়ে·· এই পারেই। সেখানে আছে

মাহিনা-করা পাহারাদারের দল। সরকারী লাইসেন্স না নিয়ে ফাঁকি দিয়ে কেউ না মাছ ধরে, এরা তার পাহারাদারী করে। এ-কাজের দরুণ এ-মহল্লায় পাহারাদারদের প্রতিপত্তির সীমা নেই।

বালির উপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাছের আঁশ ছড়ানো। লম্বা ক'টা খুঁটিতে কখানা বড় জাল খাটানো··· রৌদ্রে শুকোচ্ছে। বালির বুকে সে-সব জালের ছায়া পড়ে দেখাচ্ছে যেন অতিকায় মাকড়শার জাল!

ডাঙ্গার উপরে অনেকগুলো নৌকো। দু-চারখানা ছোট ডিঙ্গিও আছে...সেগুলো পড়ে আছে ঘুমন্ত নির্জীবের মতো। সাগরের ঢেউ-গুলো আছড়ে এসে পড়ছে তাদের গায়ে···ঘুম ভাঙ্গাতে চাইছে, নৌকোগুলো জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ুক! নৌকো আর ডিঙ্গিগুলোর এধারে পড়ে আছে কাছি-বাঁধা কতকগুলো লোহার বড় হুক, নোঙর, দাঁড়, হাল, লগি, বড় বড় ঝোড়া আর ডাঁই-করা রাজ্যের পিপে।··· নৌকোগুলোর অনেক-দূরে বড় একখানা আটচালা, উইলোর শুক্‌নো ডালপালার বেড়ায় ঘেরা, মাথা পাতায় ছাওয়া। আটচালার দরজায় লম্বা একটা খুঁটিতে ছেঁড়া একজোড়া জুতো বাঁধা...জুতোজোড়ার তলা আকাশের দিকে তুলে উঁচু করে' বাঁধা···দত্যিদানার নজর না লাগে মাছে···তুক্! চালার মাথা ফুঁড়ে আর একটা খুঁটি উঁচু হয়ে আছে—সে-খুঁটির মাথায় এক-টুকরো লাল কানি বাঁধা···কানিটা বাতাসে উড়ছে··· যেন লাল নিশান! এই নিশান হলো সরকারী-চালার নিশানা।

ডাঙ্গায় যে-সব বড় বড় নৌকো···সেগুলোর পাশে খানিকটা ছায়া। সেই ছায়ায় বালির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ভাসিলি লেগো-[illegible]ভ। সরকারের কাছ থেকে গ্রেভেনশিকভ বলে' একজন ব্যবসায়ী

এখানকার ভেড়ির ইজারা নেছে...ভাসিলি হলো সেই গ্রেভেনশিকভের মাহিনা-করা চৌকিদার।

বালির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ভাসিলি·····বালিতে দুই কনুই গুঁজে দু'হাতের চেটোয় চিবুকের ভর রেখে। মুখ তুলে অপলক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে দিগন্ত-প্রসারী সাগরের পানে···দৃষ্টিতে অধীর প্রতীক্ষা···কে যেন আসবে···তার প্রত্যাশা করছে!

অনেকক্ষণ পরে নজরে পড়লো···সাগরের সুদূর প্রান্ত-সীমায় কালো একটি বিন্দু···কাঠির টুকরো যেন। ভাসিলির দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ একাগ্র হলো ...ভাসিলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

বিন্দুটি ওদিকে ক্রমে বড় হচ্ছে...স্পষ্ট হচ্ছে···এগিয়ে আসছে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে। ভাসিলির বুকখানা ঐ সঙ্গে তালে-তালে দুলছে।

ভাসিলি উঠে বসলো···কপালের উপর দু'হাত অঞ্জলি-বদ্ধ করে'। সূর্য্যের প্রখর রশ্মি থেকে চোখদুটোকে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে সে দেখলো, দেখে দাঁড়ালো···তারপর এগিয়ে এলো জলের দিকে...সাগরের বুকে এগিয়ে-আসা বিন্দুটির উপর একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে।

বিন্দুটি এখন নৌকোর আকারে সুস্পষ্ট। ঢেউয়ের বুকে বুকে গড়িয়ে নৌকোখানা এগিয়ে আসছে। ভাসিলির মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি ···প্রতীক্ষায় প্রহর-গণার সমাপ্তি এতক্ষণে···মাল্‌ভা তাহলে আসছে! এসে হাসির উচ্ছ্বাসে এখনি আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলবে···নৌকো থেকে নেমেই ভাসিলির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে সাগরের ঢেউয়ের মতো···তার পর দু'হাতে ভাসিলিকে জাপটে জড়িয়ে তার পিঠে-বুকে মুখ ঘষবে·· চুমোয়-চুমোয় ভাসিলির জীর্ণ শুষ্ক গাল আর ঠোঁটদুটোকে রসালো করে তুলবে! এমন তীব্র আবেগে মালভা চুমো খায় যে

কাছাকাছি যে শীগল্‌গুলো বসে থাকে, মালভার সে মত্ত মাতন দেখে তারা ভয় পেয়ে উড়ে যায়। কি নেশা-মেশানো মালভার যৌবন-নিটোল অঙ্গে! মরালের মতো গ্রীবা, মাথার খাটো চুলগুলো যেন আঙুরের থোকা···ঠোঁটছুটি তাজা আঙুরের মতো নিটোল, রসালো ···বুকে যেন ছুটি পদ্মকলি···মালভার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে হাসির উচ্ছ্বাসে সব সময় নেশা জড়িয়ে আছে। আদর-সোহাগের প্রথম পর্ব্ব এইখানে চুকিয়ে ছুজনে তারপর যাবে ভাসিলির চালাঘরে···সেখানে বোতল খুলে ভড্‌কা-পান, তার পর এসে এই বালিতে পড়ে হাসি, গল্প, গড়াগড়ি, জড়া-জড়ি···যতক্ষণ না সূর্য্য পাটে বসে! সন্ধ্যা হলে তখন চা···চায়ের সঙ্গে রাশ-রাশ নিমকি-বিস্কুট। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে এক-শয্যায় বাহুতে বাহু বেঁধে এক হয়ে ছুজনের নিশি-যাপন···আঃ, এ-বয়সেও জীবনকে কি রঙে না মাল্‌ভা রাঙিয়ে রেখেছে!

মালভা থাকে এ-পারে বাঁকের ওদিকে···অনেক দূরে। সাগর এখানটায় ছ'সাত মাইল চওড়া। মালভা এখানে ভাসিলির কাছে আসে··· ফী রবিবারে আর ছুটীছাটার দিনে···এ একেবারে রুটিন বাঁধা। ঝড় হোক, জল হোক, ভূমিকম্পে পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে যাক, মালভার আসার কামাই হয়নি কোনো কালে। এসে সারাদিন আর রাত্রিটা সে থাকে ভাসিলির কাছে—পরের দিন ভোরে ঘুমন্ত সাগরের বুকের উপর দিয়ে ছোট নৌকোয় বসিয়ে ভাসিলি তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে। রাত্রে ছুজনে কতটুকুন্ ঘুমোয়! ভোরে নৌকোয় বসে মাল্‌ভা···ঘুমে ঢুলুঢুলু ছুটি চোখ, ভোরের বাতাসে কত দিন ঘুমে ঢুলে পড়ে। ভাসিলি হাল ধরে' নৌকো চালায় আর নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে মালভার সেই বিভোর-করা তন্দ্রাতুর মূর্ত্তির পানে।...থেকে থেকে মালভা চোখ মেলে চায়···ভাসিলির বিমুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি লক্ষ্য করে'

হাসে, হেসে ভাসিলিকে বলে—সারাক্ষণ আমার পানে চেয়ে কি দ্যাখো বলো তো ? এত দেখেও কি তোমার দেখার আশ মেটে না ?

আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় ভাসিলি নিশ্বাস চাপতে পারে না।

নিশ্বাস ফেলে ভাসিলি বলে,—নিজের পানে যদি কখনো চেয়ে দেখতিস···তাহলে আর তোর মুখে হাসি ফুটতো না···নিজের চেহারা দেখে নিজেই তর্ হয়ে থাকতিস !

চোখে কটাক্ষের বিদ্যুৎ ফুটিয়ে মাল্ভা বলে,—থাক, থাক্··· তুমি খুব রসিক হয়েছো···মন-রাখা রসালো কথার বেশ পুঁজি জমিয়েছো···খু-উ-ব বাক্যবাগীশ তুমি !...নৌকোয় করে ফেরবার সময় মালভার ঘুমের ঘোর যেদিন একটু বেশী হয়, সেদিন তাকে নৌকোয় বসিয়ে রাখা যায় না, নৌকোর খোলে সে শুয়ে পড়ে দেহখানাকে কুঁকড়ে গুটিয়ে এতটুকুন্ করে। তখন তার সে-মূর্ত্তির পানে চেয়ে চেয়ে ভাসিলির বুক ভরে ওঠে নিশ্বাসের বাষ্পে·· ভাসিলি ভাবে, আজ তো সবে সোমবার···মালভা আসবে আবার সেই রবিবারে···পাঁচ-পাঁচ দিনের অদর্শন ! এ পাঁচটা দিন······

আজ এখন বেলা দশটা বেজে গেছে·· এখনো মাল্ভার দেখা নেই ! রোদের ঝাঁজ এমন প্রখর যে শীগল্ পাখীগুলো ক্লান্তি-ভরে বালির উপর এসে বসেছে···উড়তে আর তারা পারে না ! জ্বলন্ত রোদে ডানা মুড়ে সব বসে আছে···কতকগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে ঢেউয়ের গায়ে গায়ে···ঠোঁট ফাঁক করে···মাছ-ধরায় সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে !

নৌকো এলো কাছে, আরো কাছে···ভাসিলি দেখে, নৌকায় মাল্ভা একা নয়—মাল্ভার সঙ্গে আর একজন মানুষ। কে ও ? সেরিও-জ্কা ? ওটাকে গেঁথে আনলো কেন ?···ভাসিলি আরো দু'পা নেমে এলো জলের দিকে···দু চোখের অধীর সন্ধানী দৃষ্টি নৌকোর উপর। মালভা

ধরেছে নৌকোর হাল আর ও-মানুষটা দাঁড় টানছে···ভাসিলির দিকে পিছন ফিরে।

সেরিওজ্‌কা? না! সে তো নয়! সেরিওজ্‌কা ভীষণ মোটা··· লম্বা···ইয়া দুশমনের মতো চেহারা···তাছাড়া দাঁড় টানবার মানুষ সে নয়। এ-মানুষটা রোগা···কে?

নৌকা এলো আরো কাছে··· ভাসিলি চীৎকার করে ডাকলো,—মাল্‌ভা···

কটা শীগল বসে ঝিমুচ্ছিল···ভাসিলির চীৎকারে ভয় পেয়ে জেগে খাড়া হয়ে বসলো তারা।

নৌকো থেকে হাত নেড়ে মাল্‌ভা চেঁচিয়ে উঠলো—এসেছি।

—তোমার সঙ্গে···ও কে?

মাল্‌ভা এ-কথার জবাব দিলে না···উচ্চকণ্ঠে হো-হো করে' হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বিরক্তি-ভরে ভুরু কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে ভাসিলি বললে,—পোড়ার-মুখী!···

···কিন্তু কে ও মানুষটা? ভাসিলির মনে নানা চিন্তা কাঁটার মতো খচ্‌খচিয়ে উঠছে! ...কে জুটলো আপদের মতো?...

নৌকো আরো কাছে···আরো কাছে এলো। দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ কানে এসে লাগছে..দাঁড়ী দাঁড় তুললো নৌকোখানা ঢেউয়ে ভর করে' তীরের বেগে ডাঙ্গায় এসে বালির বুকে চেপে বসলো···সোঁ-সোঁ শব্দে।

বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে ভাসিলি বললে,—কাকে আবার সঙ্গী করে আনলি রে?

হেসে মাল্‌ভা জবাব দিলে—সবুর করো···জানো তো, সবুরে মেওয়া ফলে।

এ-তামাসা তার ভালো লাগে না···ভাসিলি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর সঙ্গী মানুষটির পানে। দাঁড়ী এখন দাঁড় রেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ভাসিলির পানে...সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে' সে হেসে উঠলো।

ভাসিলির ভ্রূ হলো কুঞ্চিত···মানুষটি যেন চেনা চেনা! স্মৃতির গহন হাতড়াতে লাগলো।···কে? কে? ছোকরা!—কম-বয়সী...মুখখানা মন্দ নয়।

মালভা বললে দাঁড়ীকে—এবার নেমে পড়ো...নেমে নৌকোটাকে ডাঙ্গায় বেশ খানিকটা উঁচুতে টেনে তোলো।···

মালভার স্বরে আদেশের ভঙ্গী। বেশী আলাপ না থাকলে এমন স্বরে মানুষ আদেশ করে না! সে-স্বরে ভাসিলির বুকখানা ধ্বক্‌ করে' উঠলো।

ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকো ওদিকে ডাঙ্গায় আধাআধি এসে পৌঁছে গেছে। ঢেউয়ের ফির্‌তি-টানে আবার না জলে গিয়ে পড়ে,...মাল্‌ভার ও-কথায় দাঁড়ী-ছোকরা নৌকো থেকে লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় নেমে নৌকো খানাকে টেনে ডাঙ্গায় অনেকখানি উঁচুতে তুললো। তারপর সে এলো ভাসিলির কাছে। এসে ভাসিলির হাতখানা টেনে জোর ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলো—আমাকে চিনতে পারলে না, বাবা? হা-হাঃ!

—আরে, ইয়াকভ্‌! তুই হঠাৎ কোত্থেকে? ভাসিলির কণ্ঠ হলো রুদ্ধ! ছেলেকে দেখে খুশী না হয়ে সে হলো ভয়ানক আশ্চর্য্য!

পিতা-পুত্রে বুকে-বুকে মিলন···ঠোঁটে-গালে অজস্র চুম্বন। ভাসিলির মুখে যতখানি বিস্ময়, ততখানি অপ্রতিভ ভাব!

ভাসিলি বললে,—আমি সেই তখন থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখছি আর ভাবছি, নৌকোতে আর-একজন কে আসছে! কি করে' আঁচ করবো যে আমাকে না-বলে না-কয়ে হুম্ করে তুই এখানে আসবি! এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কখনো! প্রথমটা আমি ভেবেছিলুম, সেরিয়োজ্‌কা··· তারপরে বুঝলুম, না, সে নয়! কে তবে? শেষে দেখি, তুই!···এর মানে? বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এমন?

কথাটা বলবার সময় এক-হাতে ভাসিলি নিজের দাড়ি কুলোচ্ছে, আর একটা হাত তার নড়ছে অস্বস্তির চাঞ্চল্য-ভরে! মালভার জন্য সে একেবারে আকুল, অধীর হয়ে আছে···কিন্তু এত বড় ডাগর ছেলের সামনে কি করে' মনের সে অধীর আবেগ প্রকাশ করে' আনন্দ পায়! ছেলের পানে বার-বার চাইছে···হুঁ, বেশ ডাগর হয়েছে··· জোরালো হাতের গুলি জোয়ান চেহারা! দেখে গর্ব্ব হলো, আনন্দ হলো···কিন্তু এ ছেলে এসে বাপের সামনে দাঁড়ালো শেষে বাপের রক্ষিতা গণিকার সঙ্গে! মনে আক্রোশের জ্বালা! সে-জ্বালায় ছেলেকে প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তুললো ভাসিলি। ছেলেকে সে সব প্রশ্নের উত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন! মাথার মধ্যে যেন হাজার সরীসৃপ কিল্‌বিল্ করছে! মনে বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা।

মালভা বললে—ছেলেকে দেখে শুধু বুকে তুলে নাচলে চলবে না, ঘরে গিয়ে ছেলেকে খাওয়াও-দাওয়াও।

এ-কথায় অনেকখানি আরাম। কথাটা শুনে ভাসিলি যেন বর্ত্তে গেল। সে তাকালো মালভার পানে···মালভার চোখে-মুখে শ্লেষের হাসি!

মালভার এমন হাসি ভাসিলি আগে কখনো দ্যাখেনি! মালভাকে ভাসিলি বেশ ভালো করেই জানে···তার দেহ···সুগোল, নিটোল...সব সময়ে ফুলের মতো নরম আর তাজা! এখনকার এ-মালভা যেন তার

চিরদিনের চেনা-জানা সে মালভা নয়! মালভার এ এক নতুন মূর্ত্তি!… এর আগা-গোড়াই অদ্ভুত!…

মালভা বাদাম খাচ্ছে…খেতে খেতে একবার চাইছে ভাসিলির পানে, পরক্ষণে চাইছে ইয়াকভের পানে…দু'চোখে কৌতুকের ঝিলিক। ভাসিলির অস্বস্তি এতে সীমাহীন হয়ে উঠলো।

তিনজনেই চুপচাপ…অনেকক্ষণ। তারপর ভাসিলি প্রথমে কথা কইলো… নিজের আস্তানা চালাটার পানে চেয়ে ভাসিলি বললে—হুঁ, ঘরেই যাবো…তোমরা আর এ রোদে দাঁড়িয়ে থেকো না—ঘরে যাও। আমি এখনি ফিরচি—মদ নিয়ে আসবো। ফিরে এসে মাছের পুর দিয়ে কচুরি তৈরী করবো'খন—চমৎকার খেতে। তুই কখনো মাছের কচুরি খাসনি ইয়াকভ! বিস্কুট দিয়ে খেতে সে যা লাগবে, দেখিস্ তখন! যা মালভা, দুজনে ঘরে গিয়ে জিরুবি। এই রোদে খোলা নৌকোয় এসে চাঁদি জ্বালা করছে, তেষ্টায় তোদের গলা শুকিয়ে আছে… যা, আমি জলও নিয়ে আসবো ভড্‌কার সঙ্গে।

চালা-ঘরের কাছে বালির উপর বড় একটা কেটলি পড়েছিল, সেটা নিয়ে ভাসিলি চললো; মালভা আর ইয়াকভ এগুলো চালার দিকে।

যৌবনের মায়া-স্পর্শে ইয়াকভের দেহ সুঠাম সুন্দর ডৌলে গড়ে উঠেছে। দু'চোখে জীবনের খর দীপ্তি…অধরে গোঁফের বাদামী রেখা… কুঞ্চিত কচি শ্মশ্রুর ঝালর প্রশস্ত ললাট · ইয়াকভের পানে বিদ্যুৎ-কটাক্ষ হেনে গাখানা একটু দুলিয়ে মালভা বললে,—কেমন, তোমার বাপের কাছে পৌঁছে দিয়েছি তো তোমাকে!

—হুঁ বলে' ইয়াকভ চাইলো একাগ্র উন্মুখ দৃষ্টিতে মালভার পানে। চেয়ে স্মিত কণ্ঠে বললে,—এসে তো পৌঁচেছি—লাগছেও চমৎকার।

সত্যি, ভারী সুন্দর জায়গা না? ঐ সাগর · কোথাও এর পার নেই, শেষ নেই! কী ভালোই লাগছে!

—হুঁ · সুন্দর সাগর।···কিন্তু তোমার বাপকে কেমন দেখলে? খুব বুড়িয়ে গেছে?

—না। বয়সের হিসাবে কোথায় তেমন বুড়িয়েছে! আমি ভেবে-ছিলুম এসে দেখবো, বাবার মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু কৈ, ক'গাছা মাত্র সাদা চুল। তা ছাড়া চেহারা বেশ জোয়ান দেখছি। এ বয়সেও বাঁধন বেশ মজবুত্!

—কতদিন পরে বাপকে দেখছো?

একটু ভেবে ইয়াকভ বললে,—তা প্রায় পাঁচ বছর। প্রায় কেন, পুরোপুরি পাঁচ বছর পরেই দেখা। বাবা আজ পাঁচ বছর বাড়ী-ছাড়া আমার বয়স তখন সতেরো বছর···

কথা কইতে কইতে দুজনে ঢুকলো চালার মধ্যে। চালার ভিতরটা ঘুপ্সীপানা মেঝেয় কখানা চ্যাটাই পাতা স্থঁটকি-মাছের গন্ধে ঘর ভরপূর। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়! মেঝের একধারে পড়ে আছে গাছের একটা মোটা গুঁড়ি···ইয়াকভ বসলো সেই গুঁড়ির উপর। মালভা বসলো মেঝেয় বিছুনো চ্যাটাইয়ে। দুজনের মধ্যে ব্যবধান আধখানা-করে' কাটা একটা পিপে। পিপেটা উপুড় করে' রাখা টেবিলের মতো ব্যবহার করা হয়। দুজনে দুজনের পানে চেয়ে বসে নিঃশব্দে একাগ্র দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখছে। অপূর্ব্ব কোনো-কিছু দেখে মানুষ যেমন তন্ময় হয়, তেমনি তন্ময় দুজনে।

অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে থাকার পর একটা নিশ্বাস ফেলে মালভা বললে,—এইখানেই তুমি তাহলে এখন কাজ করবে? সেইজন্য এসেছো। নৌকোয় তাই তো বলছিলে!

—হুঁ, আমার তাই ইচ্ছা, তবে কতদূর কি হবে, জানিনা। এখানে যদি কাজ পাই, তাহলে বেশ খুশী-মনেই থেকে যাবো।

আশ্বাস দিয়ে মালভা বললে,—কাজের এখানে অভাব নেই। কাজ ঢের পাবে'খন।

মাল্‌ভা চাইলো অন্য দিকে···উন্মনার মতো। মালভার্ উপর থেকে ইয়াকভের চোখ আর ফিরতে চায়না···চমৎকার লাগছে মালভাকে! ইয়াকভ ঘামছে···জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছে নিঃশব্দে সে বসে রইলো···কি কথা কইবে, খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ মালভা হেসে উঠলো। হেসে বললে—তোমার মা বোধ হয় অনেক কথা বলে দেছে, বাপকে বলবার জন্য···উঁ ?

ইয়াকভের মুখে হাসি ফুটলো। ইয়াকভ বললে—বলে তো দেছে... কিন্তু··· তুমি হঠাৎ এ-কথা···

—মনে হলো, তাই বললুম।

মালভা আবার হাসলো···এ হাসি ইয়াকভের কেমন ভালো লাগলো না। এ-হাসির পিছনে কি-একটা যেন অভিসন্ধি লুকোনো।··· অভিসন্ধি না থাক, খানিকটা শ্লেষ! মালভার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ইয়াকভ অন্য দিকে তাকালো···তাকিয়ে মনে করতে লাগলো মা কি-কি কথা বলে দেছে বাপকে বলবার জন্য।

সে-সব কথা মনে করতে মাকেও মনে পড়লো···মার মূর্ত্তি চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল করে' ভেসে উঠলো।···মা এসেছিল ইয়াকভকে পৌঁছে দিতে ঘাট পর্য্যন্ত···নৌকোয় উঠলো ইয়াকভ···জেটির রেলিং ধরে সজল কণ্ঠে মা বললে—তাকে বলিস ইয়াকভ, ঢাকঢাক গুড়গুড় নয়, পষ্ট বলবি, জন্মদাতা বাপ তুমি—মা এখানে একলাটি কতখানি অসহায়! মার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে এখানে এমন নিশ্চিন্ত আছো কি

করে ? লজ্জা হয় না ? মার সামর্থ্য কি···মা মেয়েমানুষ। এই যে পাঁচ-পাঁচ বছর এতটুকু উদ্দেশ নাও না —এর মানে ? মার বয়স হয়েছে · এ-বয়সে খাটবার সে সামর্থ্যও নেই···সংসারে অভাব অনটন ···সব কথা বেশ গুছিয়ে বলবি ইয়াকভ... বুঝলি।

মনে পড়লো, কথাগুলো বলবার সময় মার চোখ দুটি জলে ভরে কণ্ঠ গাঢ় হয়ে উঠেছিল।···এ্যাপ্রনের খুঁটে চোখের জল মুছে মার সেই কাতর নিশ্বাস।··· মার সে-মূর্ত্তি দেখে ইয়াকভের বুক তখন দোলেনি ! এখন সে-কথা মনে' হতে ইয়াকভের মন অশ্রসিক্ত হলো। মালভার পানে ভ্রুকুটিভরা দৃষ্টিতে চেয়ে ইয়াকভ কি যেন বলতে যাচ্ছিল,···বলা হলো না·· ঘরের বাহিরে দরজায় সামনে ভাসিলির কণ্ঠ শোনা গেল···ভাসিলি বললে—কী···যা বলেছিলুম, চটপট ফিরে আসিনি ?

এ-স্বরে দুজনেই তাকালো দোরের দিকে। ভাসিলি ঘরে ঢুকলো—তার এক হাতে মস্ত একটা মাছ, আর এক হাতে বড় একখানা ছুরি।

মালভা আর ইয়াকভের কাছ থেকে এতক্ষণ দূরে থাকার ফলে ভাসিলির মনের সে অপ্রতিভ কুণ্ঠা কতক কেটেছে, মনকে সে অনেকখানি হালকা আর সহজ করে ফেলেছে। দুজনের পানে সহজ শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ইয়াকভকে উদ্দেশ করে ভাসিলি বললে—এবার তাহলে উনুনে আগুন দি উনুনটা জেলেই আমি আসছি···এসে কথাবার্ত্তা করবো।

কথাটা বলে' উত্তরের প্রতীক্ষা না করে' ভাসিলি গেল চালার বাহিরে।

মালভা এখনো বাদাম খাচ্ছে···দৃষ্টি ইয়াকভের উপর নিবদ্ধ··· পলকের জন্য দৃষ্টি ফেরে না ! ইয়াকভের মনও আকুল··চঞ্চল। মালভাকে চোখ ভরে দেখেও তার প্রাণ যেন ভরছে না···আরো দেখতে

চায়। ছবির মতো অপরূপ মূর্ত্তি...মেয়েমানুষ এমন চমৎকার দেখতে! লজ্জায় মাঝে-মাঝে চোখ তার কেমন কেঁপে উঠছে··· ইয়াকভ অন্য দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু বেশীক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না চোখ আবার ফিরছে মালভার দিকে।

ছুজনে এমনি চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ···এ স্তব্ধতা শেষে ইয়াকভের বুকে বাজলো ভারী পাথরের মতো। অসহ্য এ ভাব। এ-ভাব থেকে মুক্তি পাবার আশায় সে বলে উঠলো,—ওহোঃ, আমার পুঁটলিটা নৌকোয় ফেলে এসেছি। আনি গে।

এ-কথা বলে ইয়াকভ গেল বাহিরে। ঘরে মালভা একা। ভাসিলি তথনি ফিরলো। ইয়াকভ নেই দেখে সে মালভার কাছে এলো এবং খিঁচিয়ে অভিযোগ তুললো,—ওটাকে ল্যাজে বেঁধে এখানে আনবার মানে? ওকে এখন তোর কথা কি বলবো...শুনি, তুই আমার কে?

তাচ্ছল্য-ভরে চোখ ঘুরিয়ে মালভা বললে,—বলবে, আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি,—আজও এসেছি।

কথাটা সহজ, সরল—ভাসিলির ভালো লাগলো। ভাসিলি বললে,—যাই বলিস, তুই একেবারে নিরেট। ঘটে যদি এক-ছটাক বুদ্ধি থাকে তোর! হুঁঃ, ডাগর ছেলে···ওর বুঝতে বাকী থাকবে তোর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? কেন এ ফ্যাসাদ বাধালি বল্ তো, এ আপদ জুটিয়ে? ঘরে আমার বৌ বেঁচে ইয়াকভের মা বয়স হয়েছে··· ছেলে! ছি ছি ছি ছি!

মুখখানা ঘুরিয়ে মালভা বললে,—তা আমি কি করবো! বা রে! তাছাড়া ওকে আমি শুধু শুধু ভয় করেই বা চলবো কেন? ও আমার কে সাত-পুরুষের কুটুম!

বলতে বলতে মালভার দৃষ্টিতে ফুটলো গভীর অবজ্ঞা। মালভা

বললে,—ওর সামনে তুমি কি জড়োসড়ো হয়ে গেলে। কেঁচোটি যেন চোর···চুরি করেছো! দেখে কি কষ্টে আমি হাসি চেপেছি, তা আমিই জানি।

একটা নিশ্বাস ফেলে উদ্বেগ-ভরা কণ্ঠে ভাসিলি বললে—তোর যেমন বুদ্ধি! সত্যি, আমি ভেবে পাচ্ছি না, এখন কি করি···

—এ কথা তোমার অনেক আগে ভাবা উচিত ছিল।

—কেন ভাববো, শুনি? কি করে' আমি জানবো যে সাগর পার হয়ে ছেলে আমার এখানে আসবেন বিনা-নোটিশে গোয়েন্দাগিরি করতে।

বাহিরে বালির বুকে পায়ের শব্দ। দুজনেই বুঝলো, ইয়াকভ আসছে। দুজনেই চুপ।

ইয়াকভ এলো। হাতে ছোট একটা থলি। থলিটা ঘরের কোণে রেখে ইয়াকভ ফিরে তাকালো মালভার পানে...দৃষ্টিতে খানিক বিরক্তি ভরে'।

মালভা সহজভাবে বাদাম চিবুচ্ছে এখনো। ভাসিলি বসলো চেপে সেই গাছের গুঁড়িটার উপর; তার পর দু-হাতে হাঁটু কচলাতে-কচলাতে হেসে ইয়াকভের পানে চেয়ে বললে,—তুই যে এখানে এলি হঠাৎ··· আসবার পরামর্শ তোকে কে দিলে, শুনি?

ইয়াকভ বললে,—কেন, আমি এখানে আসবো, সে-কথা তোমাকে চিঠিতে লিখেছিলুম তো। মা আর আমি দুজনেই লিখেছিলুম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাসিলি বললে,—চিঠি। কবে আবার আমাকে চিঠি লিখেছিলি? এমন কোনো চিঠি আমি পাইনি।

—পাওনি? বিস্ময়ে ইয়াকভের চোখ বিস্ফারিত। সে বললে,— চিঠি মোদ্দা আমরা লিখেছিলুম। তোমাকে চিঠি না লিখে আমি আসিনি।

উদাস কণ্ঠে ভাসিলি বললে সে-চিঠি আমি পাইনি,—মারা গেছে, নিশ্চয়। ডাক-ঘরের মজাই হলো এই, যে-চিঠি জরুরি, তাগ করে' সেই চিঠিখানাই ঠিক মেরে বসে।

কথাটা মোদ্দা ইয়াকভের বিশ্বাস হলো না সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করলে,—বাড়ীর কোনো খবরই তুমি জানো না তাহলে ?

—চিঠি লিখে তোমরা যদি না জানাও, কি করে' আমি তোমাদের খবর এখান থেকে জানবো, শুনি ?

ইয়াকভ তখন ফিরিস্তি দিতে লাগলো···সেখানে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্তঃ ঘোড়াটা মরে গেছে···ধান, চাল, গম যা কিছু ঘরে মজুত ছিল, তাতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত কোনোমতে তারা চালিয়েছে···খড়-বিচুলির বাষ্প নেই···না খেতে পেয়ে গোরুটাও গেছে মরে। তবু এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত টানা-হ্যাঁচড়া করে' কোনোমতে দিন কেটেছে ! শেষে অচল, নিরুপায় অবস্থা ! তারপর মায়ের সঙ্গে যুক্তি করে' স্থির হলো, মে-জুন-জুলাই এ তিনটে মাস ক্ষেতে লাঙল দিয়ে অগষ্ট মাসে ইয়াকভ আসবে এখানে ভাসিলির কাছে। এই সব খবর দিয়ে ভাসিলিকে দু-দুখানা চিঠি লিখেছে মা আর ইয়াকভ। তা কোথায় সে দু-দুটো চিঠির জবাব ! শেষে তিনটে ভেড়া বেচে কিছু ধান-চাল কিনেছে তারা, সেই সঙ্গে ক'-আঁটি খড়···বাড়ীর খবর এই। সংসার সেখানে সম্পূর্ণ অচল।

ভাসিলি সব শুনলো, শুনে বললে,— কিন্তু শুনে অবাক হচ্ছি, এমন হাল হলো কেমন করে ! আমি এদিক থেকে বরাবর টাকা পাঠাচ্ছি—সে বড় কম টাকা নয়। সে সব টাকার কি করলে তোমরা, শুনি ?

ইয়াকভ বললে,—কটা টাকা তুমি পাঠিয়েছো বলো তো চলে-আসা ইস্তক ? ঘরগুলো আগাগোড়া ছাইতে হলো না ? তারপর মারিয়ার বিয়ে

হলো, তাতে কম পয়সা খরচ হয়নি! বিয়ের জন্য তুমি তো আলাদা টাকা পাঠাওনি! সংসারের ঐ টাকা থেকেই সব খরচ হলো। তার উপর একখানা লাঙল কিনেছি। বলো তো, এই পাঁচ বছরে কত টাকা তুমি পাঠিয়েছো?

ভাসিলি বললে,—থাম্, তোকে লেকচার দিতে হবে না। কাজ যত না শেখো, বক্‌তে শিখেছো তার বিশগুণ! আচ্ছা, আমি এখন দেখি, খাবারের কত দেরী।

এ-কথা বলে বিরক্তিতে গুম্ হয়ে ভাসিলি বেরিয়ে গেল।

উনুনে পাত্র চাপানো—পাত্রে মাছ সিদ্ধ হচ্ছে। ভাসিলি বসলো উনুনের সামনে। পাত্রের মুখে ফেনা জমেছে—হাতায় করে' সেগুলো তুলে উনুনের আগুনে ফেললে! মাথার মধ্যে চিন্তার কালো কালো হাজার ছায়া! ইয়াকভ যে-সব খবর দিলে, মন তাতে দুললেও বৌ আর ইয়াকভের উপর আক্রোশে ভরে' উঠলো। পাঁচ বছর বাড়ীতে টাকা পাঠায়নি সে? অত টাকা পেয়েও পৈত্রিক ক্ষেতখানাকে এমনভাবে নষ্ট করেছে! মালভা যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে ইয়াকভকে স্পষ্ট জবাব দিয়ে বলতো, বাপকে না জানিয়ে, বাপের কথা না নিয়ে যে-ছেলের এখানে আসবার বুদ্ধি হয়, সে ছেলের বুদ্ধি খেলে না শুধু ক্ষেত-খামারের কাজে। এতকাল এখানে থেকে যে ক্ষেত-খামারের জন্য মনে এতটুকু দুশ্চিন্তা জাগেনি, এখন সে ক্ষেত-খামারের বেদনায় মন টনটনিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো নিরন্ধ্র অন্ধকার গভীর কূপ—অতল কালো অন্ধকারে ভরা···সেই অতল কূপে ভাসিলি পাঁচ বছর ধরে' তার রোজগারের কড়ি দু-হাতে নিক্ষেপ করেছে। সব টাকা অন্ধকূপে তলিয়ে গেছে! ভস্মে কী ঢেলেছে ভাসিলি! এতগুলো টাকা মিথ্যা নষ্ট হলো! এর চেয়ে যদি বাড়ীতে টাকা না পাঠাতো!

হাতা দিয়ে পাত্রের মাছগুলো নাড়তে নাড়তে ভাসিলি মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললো।

উনুনের রন্ধ্রপথে আগুনের ছোট ছোট হলদে শিখগুলো লক্লকিয়ে উঠছে...প্রখর রোদে সেগুলাকে দেখাচ্ছে মলিন, ক্ষীণ! নীলাভ স্বচ্ছ ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ভর করে চলেছে সাগরের বুকে! সেখানে মিলিয়ে মিশে যাচ্ছে সূর্য্যের তীক্ষ্ণ তীব্র রশ্মিতে।

সেই ধোঁয়ার পানে চেয়ে ভাসিলি ভাবছে, এ-বয়সে সব দায়-দুশ্চিন্তা এড়িয়ে জীবনকে বেশ সহজ আর আরামের করে' নিয়েছিল···বন্ধনের শিকল কোনো দিকে না বাজে! ছেলে ডাগর হয়েছে। ওদিককার ভার অনায়াসে সে বইতে পারবে···ভাসিলি এখন শুধু আরামে আয়েসে থাকবে। ছিল তাই। মাঝখান থেকে ছেলে এসে উদয় হলো দুর্গ্রহ অভিশাপের মতো!

মালভা কে, তা ও বোঝেনি? এখন মুখ দেখানো···

ঘরে বসে মালভা···নানা স্নেহে কৌতুকে ইয়াকভকে বিঁধে খেলা করছে। মালভার চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের লীলা-তরঙ্গ।

···দুচোখে আবেশ, কণ্ঠ মদির, মালভা বলছিল ইয়াকভকে,—ভালোবাসার মানুষকে সেখানে রেখে এলে···এখানে কাকে নিয়ে কি সুখে এখন থাকবে গো?

কথাটা ইয়াকভের খুব বিশ্রী লাগলো। তাচ্ছিল্যভরে সে জবাব দিলে, —থাকতেই হবে। কথায় বলে, যখন যেমন···

মালভার চোখে সেই আবেশ-ভরা বিহ্বল-করা দৃষ্টি! সে-দৃষ্টিতে ইয়াকভকে বিঁধে মালভা বললে,—তোমার ভালোবাসার মানুষটী কেমন দেখতে গো? খুব সুন্দরী নিশ্চয়?

ইয়াকভ কোনো জবাব দিলে না।

—কি, জবাব দাও! ধ্যানে রইলে কেন? আমার চেয়েও সুন্দরী না কি

প্রশ্নটা কাঁটার মত ইয়াকভের মনে বিঁধলো। মালভার পানে সে তাকালো...মালভাকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখলো,তার সারা অঙ্গ বিশ্লেষণ করে'। দেখলো, নিটোল দুটি গাল, পরিপুষ্ট! ঠোঁট দুটিতে তাজা গোলাপের আভা...শিশিরে ভেজা ফুলের মতো টুকটুকে। গায়ে গোলাপী রঙের সুতির ব্লাউশ টাইট্! ঘাড়-গলা চমৎকার সুঠাম সুডৌল! পীন বক্ষ-যুগ ব্লাউশের টাইট বাঁধনে যেন থাকতে চায় না! আধ নীমিলিত দুই চোখ—নেশায় আচ্ছন্নের মতো। দেখে ইয়াকভ শিউরে উঠলো...তার সারা দেহ আগুন হয়ে উঠলো। ইয়াকভ নিশ্বাস ফেললো, নিশ্বাস ফেলে বললে—এ কথা জিজ্ঞাসা করার মানে?

খিল্ খিল্ করে' হেসে মালভা বললে—মানে, তোমার বয়সের মানুষের সঙ্গে এ ছাড়া আর কি নিয়েই বা কথা কই, বলো?

—হুঁ...তা এ-কথায় হাসির কি আছে?

মালভা বললে,—কি করবো? তোমায় দেখে আমার খালি হাসিই পাচ্ছে।

—কেন? আমি সঙ, না বাঁদর?

ইয়াকভের কথা বেশ ঝাঁজালো। কথাটা বলে ইয়াকভ মুখ ফেরালো।

মালভা জবাব দিলে না হাসলোও না...নীরব।

মালভাকে দেখে ইয়াকভ বুঝেছে, বাপ ভাসিলির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি! তাই মালভার দিকে ভালো করে চাইতে, মালভার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা কইতে তার কেমন লজ্জা হচ্ছে। বাপের এ-ব্যাপারে ইয়াকভ্ এতটুকু

আশ্চর্য্য হয়নি। অনেক লোকের কথাই শুনেছে,...স্ত্রী-পুত্রকে বাড়ীতে রেখে যারা বিদেশে থেকে কাজ করে, পয়সা রোজগার করে, মেয়ে-মানুষের সংস্রব ছেড়ে তাদের মধ্যে অনেকেই থাকতে পারে না, জীবন বিরস তিক্ত বোধ হয়...কাজে উৎসাহ পায় না। একটি সঙ্গিনী না হলে বাঁচতে পারে না। বাবা এখানে একা...বয়স হলেও স্বাস্থ্য ভালো, মজবুত জোয়ান্ মানুষ... নিরালা সাগর-তীর...কাজেই মালভাকে করে নিয়েছে সঙ্গিনী। সঙ্গে সঙ্গে মার কথা মনে পড়্‌লো ইয়াকভের। বেচারী মা! দিন-রাত কি খাটুনি খাটছে! কত দুশ্চিন্তা, একা অসহায় নারী, দাসী-বাঁদীর মতো দিন কাটাচ্ছে চিরকাল। দাস্যে মার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই কোনো দিকে একটু আশাও নেই! বেচারী মা!

ভাসিলি ডেকে বললে,—খাবার তৈরী। চামচ্‌গুলো ধুয়ে মেজে আন্ মালভা।

কথা শুনে ইয়াকভ চমকে উঠলো। বাপের পানে তাকালো। মালভার সঙ্গে বাপের সম্পর্ক তা হলে বেশ নিবিড় এবং অনেক-কালের। ...বাপের ঘরে মাল্‌ভাই সর্ব্বময়ী...তারি ঘরকর্ণা...নাহলে কোথায় চামচ থাকে, মালভা জানবে কি করে'?

ভাসিলির কথায় মালভা উঠে সেল্‌ফ্‌ থেকে কতকগুলো চামচ নিলে নিয়ে বললে,—এগুলো ধুয়ে মেজে আনি। অমনি ঐ সঙ্গে নৌকোয় এক বোতল ভড্‌কা এনেছি, বোতলটাও নিয়ে আসি।

মালভা গেল বেরিয়ে। বাপ আর ছেলে দাঁড়িয়ে দেখলো। তারপর মালভা চোখের আড়াল হলে খানিক পরে ভাসিলি তাকালো ইয়াকভের পানে; তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—এর সঙ্গে তুই জুটলি কি করে?

ইয়াকভ বললে—আমি তোমাদের অফিসে গিয়েছিলুম তোমার খবর

নিতে, ও তখন সেইখানে ছিল! তোমায় খবর নিচ্ছি শুনে এলো আমার কাছে। বললে, তুমি বুঝি ভাসিলির কাছে যাবে? আমি বললুম, হ্যাঁ। তখন ও বললে, তাহলে বালি ভেঙ্গে কত হাঁটবে···অনেকখানি পথ? আমি তার কাছে যাচ্ছি নৌকোয় করে'। আমার নৌকোয় অনায়াসে তুমি আসতে পারো। এই কথা বলে ওর নৌকোতেই আমাকে ও নিয়ে এলো।

—বটে! বলে' ভাসিলি একটা নিশ্বাস ফেললো। সে-নিশ্বাসে একটু যেন আরাম! তারপর ভাসিলি বললে,—আমারো মনটা আজ ক'দিন ধরে উস্‌খুস্‌ করছে তোদের জন্য। তোর কথাই. বেশী করে মনে হচ্ছিল, কত বড় হলি, কাজ-কর্ম্ম কি করছিস···

ইয়াকভ হাসলো, খুশীর হাসি। সে-হাসি দেখে ভাসিলির মনের আতঙ্ক কাটলো; মনে একটু ভরসা জাগলো। ভাসিলি বললে,—মালভা মেয়েটা ভালো,···নয়?

তাচ্ছিল্যভরে ইয়াকভ বললে,—অতশত বুঝি না, তবে হ্যাঁ, মন্দ নয়।

ভাসিলির ভ্রূ হলো কুঞ্চিত···বুকের মধ্যে আবার যেন সংশয় আর কুণ্ঠার মেঘ! এ মেঘ নিঃশেষে নিষ্কাশিত করতে না পারলে স্বাচ্ছন্দ্য মিলবে না। ভাসিলি পায়চারি করতে লাগলো। পায়চারি করতে করতেই বললে—মানুষকে কত ফন্দী-ফিকির করে' বাঁচতে হয়, ছেলে-মানুষ, তুই তার কি বুঝবি? প্রথম-প্রথম এখানে আমি বেশ ছিলুম। তারপর দিনগুলো এমন হলো যে বুঝি আর কাটে না! মানে, মানুষ তো আমি···মানুষের মন যা চায়,. যা পেলে সুস্থির থাকে···অর্থাৎ মনটা সব সময় কর্‌কর্‌ করতো। বিয়ে-থা করেছি...ঘরে আমার স্ত্রী··· ছেলেমেয়ে... তার উপর বয়স হয়েছে···বয়স হলে মানুষ কেমন একলাটি থাকতে পারে না! সব সময় যেন···তা, মানে, মালভা ভারী ভালো···

ও আমার অনেক কাজ করে। জামা-কাপড় সেলাই করা, কেচে দেওয়া···অসুখ-বিসুখে দেখাশোনা...একটা না একটা করছেই। আর করে বেশ খুশী-মনে। ওকে কিছু বলতে হয় না! ঠিক আপনার জনের মতো দরদ মমতা আছে। তাছাড়া কি জানিস ইয়াকভ, মরণকে ছেড়ে মানুষের যেমন থাকবার উপায় নেই, মেয়ে-মানুষকে ছেড়েও তেমনি পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারে না।

বাপের কথায় লজ্জায় ইয়াকভের মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠলো। ইয়াকভ বললে,—থাক···ও-সব কথা আমার সঙ্গে আর কেন? তুমি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকবে, আরামে থাকবে, তাই তুমি করবে···তার বিচার করবো আমি, সে-এক্তার আমার নেই।···মনে-মনে বললে, আমাকে বোঝাচ্ছো··· কাজ-কর্ম্ম করে, তোমার জামা-কাপড় সেলাই করে, সেই জন্তই ওকে রেখেছো! হুঁ ···

ভাসিলি বললে,—তাছাড়া আমার বয়স এসে দাঁড়িয়েছে পঁয়তাল্লিশের কোঠায় ··এ-বয়সে ··তা, ওর জন্য আমার এমন কিছু খরচ হয় না। বিয়ে-করা স্ত্রী তো নয়!

ইয়াকভ এ-কথার জবাব দিলে না। ভাবলো, তা নয়, আসলে ওই তোমার পকেটটি ফুটো করেছে আমি খুব বুঝি।

মালভা ফিরলো...হাতে ভডকার বোতল আর তারের রিঙে বাঁধা একরাশ নিমকি-বিস্কুট।...

ক'জনে খেতে বসলো···কারো মুখে কথা নেই। মাছের বড় কাঁটা-গুলো চিবিয়ে···বিস্কুটের পর বিস্কুট মুখে পুরে...ইয়াকভ খাচ্ছে রাক্ষসের মতো। সকলের চেয়ে বেশী। কত কাল পেট ভরে' খেতে পায় নি। ভাসিলি দেখছে ইয়াকভের খাওয়া...বিরক্তিতে তার মুখ-চোখ লাল! মালভাও দেখছে···তার চোখে করুণ মমতা। দেখে ভালো লাগছে

…মাছের বড় বড় কাঁটাগুলোকে ইয়াকভ চিবুচ্ছে না—গিলছে। ভাসিলি খাচ্ছে…আপন-মনে। মনে দুশ্চিন্তার কাঁটা…খাওয়ায় তেমন রুচি নেই। মনের মধ্যে চাকা ঘুরছে…এবং ইয়াকভ না বুঝতে পারে, এমনি ভাবে উপায় ঠাওরাচ্ছে…যাতে করে' ইয়াকভ এখানে না থেকে যায়, বাড়ী ফেরে।

অদূরে বালু-তটে ঢেউগুলো আছড়ে এসে পড়ছে·· করুণ মৃদু রোলে। শীগলের ডাক...রোদ আরো প্রখর…সে-রোদে বালি তেতে আগুন। সাগরের বুক ছুঁয়ে বাতাস আসছে বয়ে…সে-বাতাস তাই স্নিগ্ধ শীতল।

একরাশ রুটি আর মাছের কচুরি, তারপর প্রাণ ভরে' ভড্‌কা …ভাসিলির চোখ দুটো রীতিমত ভারী হয়ে উঠেছে। মুখে নির্জীব হাসি সেই সঙ্গে ঘন-ঘন হাই—মাঝে মাঝে কাসির দমক্ ভাসিলি বার-বার ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে মালভার দিকে—মালভার সেদিকে খেয়াল নেই। শেষে দায়ে পড়ে ভাসিলিকেই কথা কইতে হলো। ভাসিলি বললে ইয়াকভকে উদ্দেশ করে',—যা রে, এবার হাত-পা ছড়িয়ে একটু গড়া'গে যা। এই রোদে এসেছিস...জিরিয়েনে! পারিস তো একটু ঘুমো…তারপর চায়ের সময় ডেকে দেবো'খন।

—হুঁ…তাই করি,…একটু ঘুমিয়ে নি। এ-কথা বলে মেঝেয় পাতা চ্যাটাইয়ের উপর ইয়াকভ দেহখানা প্রসারিত করে' দিলে, দিয়ে বললে,— তোমরা…কোথাও যাবে না কি?

চোখে রুক্ষ কটাক্ষ…ইয়াকভের পানে চেয়ে একটু রূঢ় স্বরেই ভাসিলি বললে,—তোমাকে তার নোটিশ দিতে হবে নাকি? সেদিনকার ছেলে,…ডেঁপোমি স্থাখো না!

কথাটা শেষ করে' ভাসিলি চললো দরজার দিকে।

মাথা তুলে বেশ চড়া গলায় ইয়াকভ বললে,—আমি সেদিনকার ছেলেই বটে! কিন্তু সেদিনকার ছেলে যা করতে পারে, দেখে তাজ্জব বনে যাবে!

ইয়াকভ উঠে দাঁড়ালো খাড়া হয়ে···তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো মালভার পানে··· এবং পরক্ষণে চুপচাপ শুয়ে পড়লো চ্যাটাইয়ের উপর।

মোটা একটা খুঁটি নিয়ে ভাসিলি হুম্ হুম্ করে' ঘরের দেওয়ালে তিনটে ঘা মারলো। মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইয়াকভ শুয়ে চোখ বুজলো, একে ক্লান্তি, তার উপর অনেকখানি ভড্‌কা গিলেছে·· শরীর অবশ। সে ঘুমোলো। মালভা এলো ঘর থেকে বেরিয়ে।

বালির উপর দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসে ভাসিলি আর মালভা বসলো নৌকোগুলোর পিছনে যে-ছায়া, সেই ছায়ায়। ভাসিলির বিরক্তির সীমা নেই। দু'চোখ ভ্রূকুটি-ভরা। চুপ করে' কি খানিক ভাবলো। মালভা চেয়ে আছে উদাস নেত্রে সাগরের জল-প্রসারের দিকে··· অপলক দৃষ্টি। দুজনে পাশাপাশি বসেছে···

হঠাৎ ভাসিলি ডাকলো—মালভা...

মালভা ফিরে তাকালো···ভাসিলির মুখে-চোখে বিরক্তি মাখানো। মালভা বুঝলো কোথায় কি একটা হয়েছে···তাই ভাসিলির মনে এতখানি অস্বস্তি!

একটু অনুযোগের সুরে ভাসিলি বললে,—ও তামাসা পেয়েছে, না? আমার পানে চোখ তুলে যে-ছেলে তাকাতে পারতো না, ভয়ে জুজুটী হয়ে থাকতো ,সে এখন আমার পানে তাকায় এতখানি তাচ্ছিল্য ভরে'! কথায় কথায় বাঁকা হাসি। এতখানি আস্পর্দ্ধা হয়েছে শুধু তোর জন্য!

বিস্মিত কণ্ঠে মালভা বললে—আমার জন্য। বা রে! তার মানে? আমি আবার করলুম কি, শুনি?

—হ্যাঁ···হ্যাঁ করেছিস, অনেক-কিছু করেছিস। ভাসিলির স্বরে অসহিষ্ণুতা।

—চমৎকার! বুড়ো বয়সে তোমার হবে সৌখীন ব্যামো, আর আমি হবো তার জন্য দোষী। হুঁঃ! তা আমাকে এখন কি করতে বলো তুমি, শুনি? তোমার এখানে আর আসবোনা, এই তো? তা বেশ, আমি আর আসবো না।

ভাসিলি বললে,···গলা একটু নরম···ভাসিলি বললে—সাধে তোকে বলি, রগচটা পোড়ারমুখী। তোদের জাতে সবাই সমান রে। দেখিস্ নি, ও আমার পানে চাইছে যেন কৃপার দৃষ্টিতে···কথাগুলো কেমন চ্যাটাং-চ্যাটাং···আমি যেন ওর সমযুগ্যি মানুষ···আমার সঙ্গে মস্করা করে। তার উপর তুইও···

ভাসিলি একটা নিশ্বাস ফেললো। নিশ্বাস ফেলে আবার বললে,—পৃথিবীতে তোকেই শুধু আমি জানি···তুই আমার একমাত্র আপনার জন ···দরদ করতে, মমতা করতে, তুই ছাড়া আমার আর কে আছে, বল্? আর তুইও শেষে আমার পিছনে লাগিস্···আমাকে নিয়ে যা-তা করিস্! আমার কপাল।···

এ-কথা বলে মালভার কাছ থেকে একটু সরে বসলো···বসে' উদাস নেত্রে চেয়ে রইলো সাগরের দিকে সুদূর দিগন্ত-রেখার পানে··· নির্বাক···নিস্পন্দ।

হাঁটু দুটো মুড়ে বসেছে মালভা। দু-হাতে হাঁটু চেপে ধরে' দেহখানা দোলাতে দোলাতে মালভা একবার চাইলো ভাসিলির দিকে···তার পর সাগরের দিকে। দু' চোখে হাসির অপরূপ রশ্মি।

রূপ-যৌবনের জোরে দিগ্বিজয় করতে পারে ভেবে যে-সব মেয়ে গর্ব্ব বোধ করে, মালভার হাসিতে সেই গর্ব্ব উথ্‌লে পড়ছে!

সাগরের বুকে পাল-তোলা একখানা বড় নৌকো চলেছে ···চলেছে···যেখানে আকাশে-সাগরে গায়ে-গায়ে মিশে এক হয়েছে···সেই দিকে। নৌকোখানাকে মনে হচ্ছে, যেন একটা বড় পাখী··· ভেসে চলেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ···হঠাৎ ভাসিলি বললে—কি··· কথা বলছিস্ না যে?

মালভা বললে— ভাবছি···

—কি ভাবছিস, শুনি?

ভুরু দুটো কুঁচকে মালভা বললে,—না, এমন কিছু দুর্ভাবনা নয়। তার পর দু'মিনিট চুপ করে থেকে আবার বললে,—ভাবছিলুম, তোমার ছেলেটিকে দেখতে খাশা।

ভাসিলির বুকে হিংসার শিখা চিড়িক করে' উঠলো। কপাল কুঁচকে ভাসিলি বললে,—তাতে তোর কি?···মানে···

নিশ্বাস ফেলে মালভা বললে—মানে আছে বৈ কি···বেশ ভালো মানে।

—খবর্দ্দার বলছি, মালভা···দু'চোখে আগুন জেলে কঠিন কণ্ঠে ভাসিলি গর্জ্জে উঠলো,—এতটুকু বেচাল নয়। হুঁশিয়ার করে' দিচ্ছি। এমনিতে আমি ঠাণ্ডা চুপচাপ থাকি কিন্তু মেজাজ যদি বিগড়োয়, জানিস, আমার বুকে শয়তানের বাসা···শয়তান ঘুমিয়ে আছে··· খুঁচিয়ে তাকে জাগাস নে, বলছি...খবর্দ্দার। টুঁটি টিপে মেরে ফেলবো। চিহ্ন রাখবো না তোর।

কথাটা বলে' ভাসিলি বীর-দর্পে হাতার আস্তিন গুটোলো, দাঁতে দাঁত ঘষলো।

মালভা কথা কইলোনা। ভাসিলির রাগ তাতে আরো বাড়লো। ভাসিলি বললে,—সকাল থেকেই তোর আজ দুর্বুদ্ধি জেগেছে...লক্ষণ ভালো নয়, মালভা। এখানে এসে ইস্তক তোর হাব্‌ভাব যা দেখছি, ...মানে, ঠিক বুঝচি না, তোর কি হয়েছে, কেন হয়েছে। যোদ্দা, কোনো রকম বেচাল যদি দেখি, তাহলে তোকে আর আস্ত রাখবো না। জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো...হুঁ। আমায় ঘাঁটাস নে। তোর মতো মেয়ে-মানুষকে টিট্‌ করতে হয় কি করে', আমার তো বেশ ভালো রকম জানা আছে, বুঝলি!

ভাসিলির পানে না চেয়ে বেশ চড়া গলাতেই মালভা বললে,—থাক, থাক, তোর ভয়ে আমি একেবারে কেঁচো হয়ে যাবো! মরণ আর কি!

ভাসিলি বললে—তবু হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে দাগাবাজি করলে তোর রক্ষা থাকবে না।

—তুই আমাকে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাস্...বটে! আমি, বলে...

মালভার কথা শেষ হবার আগেই ভাসিলি ফোঁশ করে উঠলো,—একটু কিছু দেখেছি কি তোর মুণ্ডুখানা ধড় থেকে...

—কী! আমাকে মারবি তুই? মালভা রুখে উঠলো।

—মারবোই তো...ভয়ানক রকম মারবো...সে-মার খেয়ে হাড় গোড়-ভাঙা দ হয়ে থাকবি। আবার হাঁক পাড়ে! ইঃ, কি আমার রাজ-রাজেন্দ্রানী গো!

দৃষ্টিতে আগুন জেলে ভাসিলিকে ভেংচে মালভা বললে—আমি আমিই...মালভা...রাজ-রাজেন্দ্রানী নই যেমন, তেমনি তোর বিয়ে-করা বৌও নই যে ধরে অমনি মারলেই হলো! বিয়ে-করা বৌকে

মেরে মেরে তোর ভারী সাহস বেড়েছে, না ? ভাবিস, সকলকে তেমনি মেরে বেড়াবি ! তুই আমার মনিব নোস, আমিও তোর বাঁদী নই যে মনে করলেই আমাকে মারবি আর আমি মুখ বুজে তোর মার খাবো ! মেরে একবার মজা ছাখ্ না। আমি কারো পরোয়া রাখি না ! কারো তোয়াক্কা করি না ! যখন যেমন আমার খুশী হবে, তাই করবো। কে বাধা দেয়, একবার দেখি। তুই ? ছেলেকে দেখে মনে রিষ জেগেছে ভয় হয়েছে, ছেলে যদি··· ওমা, ছেলেকে দেখে সকালে মুখের যে চেহারা হয়েছিল, দেখে লজ্জায় মরে যাই।···কি তোর আছে বল্তো, যার জোরে আমাকে চোখ রাঙিয়ে দাবে রাখতে চাস ?

কথাগুলো বলে' মালভা ভাসিলির দিকে পিছন ফিরে বসলো। ভাসিলি নিঃশব্দে শুনলো কথাগুলো···তার উপর মালভার ঐ-রাগে রাঙা মুখ... বিহ্বল-করা মূর্ত্তি ! ভাসিলির রাগ নিমেষে জল হলো মালভাকে বুকে নেবার জন্য মন আকুল হলো, চঞ্চল হলো। কিন্তু কি করে' নেবে ? ছেলে এসে পড়ে যদি ?

সুর বদলে অভিমান-ভরা কণ্ঠে ভাসিলি বললে—এই তোর মস্ত দোষ মালভা, একটুতে তুই একেবারে ভয়ানক চটে উঠিস ! কখ্খনো আমার মন বুঝলি নে ! জানিস, তোকে যত কড়া কথাই বলি, তোর উপর আমার···

ভাসিলিকে কথাটা শেষ করতে দিলে না মালভা। বলে উঠলো— থাক, থাক, ঢের হয়েছে আর সোহাগ দেখাতে হবে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় এসেছে জল দিতে ! শোনো, তোমাকে আর একটা কথা বলি তাহলে···সেরিওজ্কার কাছে দর্প করে' তুমি বলে এসেছো, তুমি ছাড়া আমার আর গতি নেই···তুমি ত্যাগ করলে আমি

নাকি একদণ্ড প্রাণে বাঁচবো না। তাই যদি তুমি ভেবে থাকো তো সে মস্ত ভুল। তোমাকে ভালোবাসি বলে' আমি এখানে ছুটে আসি, তোমাকে না দেখলে আমি দম্ ফেটে মরে যাবো তাই তোমাকে দেখতে আসি, এ-সব মোটেই সত্যি নয়। আমি এখানে আসি, এ-জায়গাটা আমার ভারী ভালো লাগে, তাই। এখানকার আকাশ, সাগর, তার উপর জায়গাটা বেশ নিরিবিলি…এই সবের জন্যই আসি, তোমার জন্য নয়। এখানে তুমি না থেকে যদি সেরিওজ্কা এখানে থাকতো, তাহলেও আমি আসতুম। তোমরা না থেকে, তোমার ছেলে যদি এখানে থাকে, তাহলেও আসবো। এখানে যদি শুধু রাজ্যের কুলি মজুর মিস্ত্রী লোহার চামার থাকে, তবু আসবো। আমি এখানে আসি শুধু এই জায়গার মায়ায়…তোমাদের কারো মায়ায় নয়। তোমাদের পুরুষ-জাতটাকে আমি কেয়ার করি না। আমার এই-রূপ— আর এই বয়স…এর জোরে আমি জানি, যে-পুরুষকে চাইবো তাকেই পাবো আমার এই হাতের মুঠোয়। তা সে রাজা-রাজড়াই হোক আর তোমার ছেলেই হোক্। এ-সামর্থ যে আমার আছে, তা আমি খুব ভালো করেই জানি। তুমি ভাবছো, তোমাকে পেয়ে আমি বর্তে গেছি! ভুল ভুল মস্ত ভুল তোমার, তুমি বদ্ধ পাগল, তাই এমন কথা ভাবো!

কথা নয়, যেন গন্‌গনে আগুনের কুচি। কথাগুলো বলতে বলতে মালভার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

ভাসিলির পায়ের তলা থেকে মাটী যেন সরে যাচ্ছে! এমন কথা বলে মালভা? এত তার তেজ! ওর ঐ রূপ আর বয়স! যৌবন! রাগে আগুন হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো মালভার উপর…মাল্‌ভার পা দুখানা ধরে টানলো। মালভা পড়ে গেল। ভাসিলি তখন তার ঘাড় ধরে'

সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে—এমন তোর তেজ ! এত অহঙ্কার !

বল্‌তে বল্‌তে তাকে চেপে পিষে যেন গুঁড়ো করে' ফেলবে, এমন···

মালভা নির্বাক। নিজেকে ভাসিলির কবল থেকে ছাড়িয়ে নেবার এতটুকু প্রয়াস নেই। শুধু চেয়ে আছে ভাসিলির দিকে···বিস্ফারিত চোখ! এমন···যে মনে হচ্ছে, চোখের তারা দুটো বুঝি এখনি ছিটকে খশে পড়বে !

ভাসিলি তাকে চটকে দুমড়ে পিষে যেন ময়দা ঠাশছে ! তার পর ! ধরলো ঘাড়। মালভা শুধু হাত দিয়ে ধরলো ভাসিলির হাতখানা। যেভাবে ঘাড়খানা ধরেছে···

ভাসিলির রাগ পলে পলে বাড়ছে···চড়া গলায় ভাসিলি বললে,—তোরা চিরকাল বেইমানী করিস তোদের হাড় হদ্দ আর আমার জানতে বাকী নেই! এতকাল যে মিট্‌মিটেটি হয়ে আছিস, সে শুধু তোর পেটের দায়ে। তোর ঐ পেট আমিই ভরিয়ে এসেছি আর তার জন্যই আমাকে আদর করেছিস, দরদ যত্ন করেছিস। যা হুকুম করেছি, কুত্তার মতো পায়ে লুটিয়ে তুই তাই করেছিস !

বলতে বলতে হাত দুখানা আবার নিশপিশ করে উঠলো। মালভার মুখখানাকে বালিতে গুঁজড়ে ধরে' তার পিঠে মারলো ঘুষি···বেশ জোরে দুই ঘুষি। তার উপর গোটাকতক চড় ! ঘুষি চড় পড়ছে মুহুর্মুহু···সেই সঙ্গে মুখে তর্জ্জন,—তুই যেমন কুকুর, আজ তোর তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা ! রূপের অহঙ্কার যৌবনের দেমাক তোর বড় বেশী! তুই সাপ ! রূপ নয়, বয়স নয়,···ও তোর-বিষের দেমাক !

এ কথা বলে' মালভাকে ধরে তুলে আবর্জ্জনার মতো ছুড়ে দিলে ভাসিলি একটু দূরে···দিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সরে গেল···অনেকখন

সরে' গিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো···চোখের দৃষ্টি···সাগরের অন্তহীন প্রসারে নিবদ্ধ।

মালভা পড়ে আছে বালিতে···মাথার চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে··· ব্লাউসের খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, কাঁধ থেকে হাত পর্য্যন্ত খোলা·· মুখচোখ ফুলে উঠেছে···ছিন্ন মলিন মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে রূপ আরো জলজলে!

মালভার মনে আক্রোশ হচ্ছে ধূমায়িত···থাক্, কুকুরের মার! মনের কথাগুলো খুলে বলতে পেরেছে, মালভা এতে খুব খুশী···নিজেকে কলুষহীন মনে হচ্ছে।

ভাসিলি কাছে এলো। দু'চোখে তখনো বিজয়ের উল্লসিত দৃষ্টি! তাকালো মালভার পানে। মালভাও ফিরে তাকালো ভাসিলির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। মালভা হাসলো। মোলায়েম মধুর হাসি দুটি গালে ছোট দুটি টোল্···ভাসিলি তার পানে চেয়ে নির্বাক মুগ্ধ।

আবার রাগ হলো···মালভার এতটুকু দুঃখ নেই?

মালভার হাতখানা ধরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ভাসিলি বললে,—কথা কচ্ছিস্ না যে! কি ভেবেছিস্?

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে মালভা ডাকলো,—ভাস্কা···

সোহাগের ডাক! শুনে ভাসিলি অবাক। অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠ আদরের ডাক এ!

মালভা আবার বললে,—আমাকে তুমি মেরেছো···সত্যি?

মাথা নেড়ে ভাসিলি বললে,—হুঁ সন্দেহ হচ্ছে না কি তোর?

মালভার আশ্চর্য্য নির্লিপ্ত ভাব স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দু-চোখের আবেশ-ভরা দৃষ্টি ভাসিলির মুখে নিবদ্ধ।

মায়াবিনী! ভাসিলির রাগের বিরাম নেই! ভাবলো, আরো দু'ঘা দরকার!

কিন্তু কি দৃষ্টি ও দুটি চোখে···ভারী করুণ! ভারী···মন-ভোলানো।

ভাসিলির রাগ পড়লো। চোখের দৃষ্টি হলো স্নিগ্ধ।

ভাসিলির দিকে দু'হাত প্রসারিত করে দিলে মালভা···যেন ভাসিলিকে চাইছে বাহুর বন্ধনে···বুকে! ভাসিলি বিমুগ্ধ···বিভোর।

মৃদু-মধুর কণ্ঠে মালভা বললে—আমাকে তাহলে তুই ভালো বাসিস সত্যি!

আক্রোশের জড়টুকু তখনো ভাসিলির মন থেকে নিঃশেষে ঝরে যায়নি। ভাসিলি বললে—তবু যতখানি তোর পাওনা, তার সিকির সিকি তোকে দিই নি।

সে কথায় কর্ণপাত না করে' মালভা বললে,—আমি [illegible], বড্ড পুরোনো হয়ে গেছি আমি···আমায় বুঝি আর তেমন ভালোবাসিস্ না তুই! মনে হয়েছিল, এখন ছেলে কাছে এলো, আমাকে তুই এবার তাড়িয়ে দিবি!

কথাটা শেষ করে মালভা ভুবন-ভোলানো হাসির বন্যায় ফেটে পড়লো যেন! হাসির কি রোল।

ভাসিলিও হাসি চাপতে পারলো না। হাসতে হাসতে ভাসিলি বললে—সাধে বলি, তুই একেবারে নিরেট! আরে ছেলে! ছেলেকে মেনে আমি চলবো, আমি সেই বান্দা?

ভাসিলির লজ্জা হলো, ছেলেকে সঙ্কোচ করেছিল বলে' মালভার উপর দরদে মমতায় মন বিগলিত হলো। বেশ দৃঢ় কণ্ঠে ভাসিলি বললে,—ধুত্তোর ছেলে! ছেলে আমার কে, শুনি? আমি যাতে ভালো থাকি, যাতে আরাম পাই, ছেলে করবে? ছেলের জন্য নিজের সুখ দেখবো না? আরাম দেখবো না? হুঁঃ সাধে তোকে মেরেছি? তোর দোষে তোকে মেরেছি! আমাকে তুই চটালি কেন?

ভাসিলির হাত ধরে টেনে মালভা তাকে পাশে বসালো তারপর গড়িয়ে ভাসিলির গায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে মালভা বললে—ইচ্ছা করে চটিয়েছি! তোকে পরখ করবো বলে।

—কিসের পরখ, শুনি? ভালোবাসার?

ভাসিলির উপর চোখ-ভরা বিহ্বল দৃষ্টি···মাথা নেড়ে মৃদু হেসে মালভা বললে,—তাই।

ভাসিলি একেবারে জল! বিগলিত কণ্ঠে বললে—কি দেখলি?

চোখে কুটিল কটাক্ষ···মালভা বললে—বলবো কেন?

মালভার গালে হাত বুলোতে বুলোতে সোহাগ-ভরা স্বরে ভাসিলি বললে—তোর খুব রাগ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে, না, আমি মেরেছি বলে'?

ভাসিলির নাক ধরে' নাড়তে নাড়তে মালভা বললে—না, সত্যি বলছি, একটুও রাগ হয়নি; দুঃখ হয়নি আমার।

—সত্যি?

—সত্যি বলছি। আমাকে ভালোবাসিস বলেই মেরেছিস্। যোদ্দা আমিও এর শোধ নেবো···দেখবি তখন।

এই বলে' মালভা উঠে ভাসিলির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। ভাসিলির দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে,—কি করে' শোধ নেবো বল্ তো?

আশ্বাসে আশায় ভাসিলির মন ভরে' উঠলো। সুমধুর সম্ভাবনার স্বপ্নে বুকখানা দুলে উঠলো। মালভার গাল টিপে দিয়ে ভাসিলি বললে,—কি করে'? মানে, কি করে' আমার ভালোবাসার শোধ নিবি?

—হুঁ;—বল্ না! মালভা বললে সোহাগ-ভরা কণ্ঠে।

ভাসিলি তাকে বুকের উপর তুলে নিলে—চুমোয়-চুমোয় মালভার

মুখ ভরে’ দিয়ে কোলের উপরে তাকে শুইয়ে গদগদ কণ্ঠে ভাসিলি বললে,—আমার প্রাণেশ্বরী প্রেয়সী··· জানিস, তোকে মারবার পর থেকে তোর উপর আমার ভালোবাসা আরো দশগুণ বেড়ে গেছে। সত্যি বলছি, আমার কেবলি মনে হচ্ছে, প্রাণে-মনে আমরা দুজনে মিশে এক ··নয় ?

মাথার উপর আকাশে কটা শীগল উড়ছে·· সাগর থেকে জলসিক্ত বাতাসের স্পর্শ এসে লাগছে গায়ে··· ঢেউগুলো পায়ের কাছে মৃদু গুঞ্জন গানে লুটিয়ে পড়ছে এসে—

নিশ্বাস ফেলে মালভাকে বুকের উপরে টেনে নিলে ভাসিলি। টেনে নিয়ে বললে,—তোর সরল মন, পৃথিবীর কূটকচালির কোনো কিছু জানিস্ না তুই, তাই তোকে হুঁশিয়ার করে’ দি। জানিস, পৃথিবীতে পাপ বলে’ যেগুলোকে মানুষ ঠেকিয়ে সরিয়ে রাখতে চায়, সেইগুলোই সেরা। তাতেই যা কিছু সুখ, যা কিছু রস! তুই তো কিছু বুঝিস্ না এসব, কখনো ভাবিস না! কত কথা আমার মনে হয়—বিশেষ করে’ রাতে। যখন একলা থাকি···ঘুম ভেঙ্গে চোখে ঘুম আর আসে না, তখন চেয়ে চেয়ে আমি কি দেখি, জানিস ? দেখি, সামনে ধূ ধূ সাগর তার শেষ নেই, ঢেউয়ের গর্জ্জন তুলে ফুঁশে ছুটে চলেছে। মাথার উপর আকাশ ..আর চারিদিক ঘিরে শুধু অন্ধকার। মিষ কালো অন্ধকার ...আলোর একটু ছিটেও নেই! ভয়ে আমার হাত-পা ঝিমিয়ে আসে। মনে হয়, আমি একা··· এত বড় পৃথিবীতে আমার যেন কেউ নেই! সারা পৃথিবী তখন দুলতে থাকে, ভূমিকম্পের দোলা জানিস তো, তেমনি ভূমিকম্পের দোলা! সে-দোলায় তোর কথা মনে করে’ আমি প্রাণ পাই। তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই মালভা, এই পৃথিবীতে যখন একা থাকি, কেবলি মনে হয় তোকে যদি পাশে

পেতুম ! জানিস পৃথিবীতে শুধু তুই আর আমি ! তোকে আর আমাকে নিয়েই আমাদের পৃথিবী। শুধু আমরা দুজন···এই দুজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো থাকবার দরকার নেই।

নিথর নিস্পন্দ পড়ে আছে মালভা—ভাসিলির কোলে মাথা রেখে, শুয়ে...চোখের বিহ্বল-করা অর্দ্ধ-নিমীলিত দৃষ্টি ভাসিলির মুখে নিবদ্ধ। রোদে..বাতাসে দগ্ধ জীর্ণ ভাসিলির কর্কশ মুখে মমতার মাধুর্য্য। ভাসিলির কড়া দাড়িগুলো বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে মালভার খোলা কাঁধে···ভাসিলি ঝুঁকে চেয়ে আছে মালভার পানে···ভাসিলির চোখে বিহ্বল নেশা।

ভাসিলি সব ভুলে গেছে—ছেলে..রাগ...আক্রোশ... হিংসা। মালভার মুখে-চোখে হাত বুলোচ্ছে। মালভা পড়ে আছে তার কোলে নিথর নিস্পন্দ, মাঝে মাঝে মালভার মুখখানি তুলে তার টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে করছে চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণ।

এমনি ভাবে তিন-তিন ঘণ্টা কাটলো বিহ্বল নেশার মধ্যে—তারপর সূর্য্য ঢলে পড়লো পশ্চিম আকাশে। তার প্রখর তেজ এখন শান্ত হয়েছে···ভাসিলির হলো হুঁশ। একটা নিশ্বাস ফেলে ভাসিলি বললে,—ওঠা যাক এবার। কি বলিস ? জলের কেটলি চাপিয়ে দে উনুনে..তোর মহামান্য অতিথির ঘুম ভাঙ্গবে এখনি...উঠেই তিনি চা চাইবেন।

আদর দিয়ে বেড়ালকে ছেড়ে দিলে সে যেমন অলসভাবে সরে যায়, ভাসিলির কোল থেকে মাথা তুলে মালভা তেমনি অলসভাবে উঠে দাঁড়ালো। ভাসিলির মন চায় না, মালভাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু উপায় কি ? সে একটা নিশ্বাস ফেললো...বেশ বড় নিশ্বাস। ঘাড় থেকে

বোঝা নামাতে পারলে মানুষ যেমন আরাম পায়, মালভার মনে তেমনি আরাম।

তারপর তিনজনে একসঙ্গে বসে চা-খাওয়া। অস্ত-সূর্য্যের কিরণে সাগরের বুক রাঙা হয়ে উঠেছে, ঢেউয়ের দোলায় সে রাঙা রঙে কত রকমের বাহার ফুটছে! ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কখনো দুলছে প্রবালের মালা, কখনো সাদা মুক্তোর ঝালর... অনুক্ষণ অবিরাম।

ভাসিলি চা খাচ্ছে ছোট একটা সাদা মগে করে'। খেতে খেতে ছেলেকে নানা প্রশ্ন, গ্রামে কোথায় কি হলো? কোথায় কি হচ্ছে? কারা এখনো বেঁচে আছে? কারা গেছে মরে'? পয়সা-কড়ির অবস্থাই বা কার কেমন? ছেলে দিচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব। সে জবাবের সঙ্গে নিজের স্মৃতি মিশিয়ে ভাসিলি কত কাহিনী রচনা করে' চলেছে···মালভার কাছে এ-সব কথা অত্যন্ত নীরস, অর্থহীন, তবু সে চুপ করে প্রত্যেকটি কথা শুনছে।

ভাসিলি বললে,—গাঁয়ের পুরোনো ঘরগুলো তাহলে এখনো উজাড় হয়ে যায়নি একেবারে?

ইয়াকভ বললে,—একে আর টিঁকে থাকা বলে না। না পায় কেউ খেতে পেট ভরে, না পায় পরতে। কষ্টের আর সীমা নেই কারো।

নিশ্বাস ফেলে ভাসিলি বললে,—হুঁ, তবে আমরা গেঁয়ো মানুষ... আমাদের বাঁচবার জন্য বেশী-কিছুর দরকার হয় না। মাথার উপর খড়ের একটু ছাউনি, পেটে দিতে দুখানা রুটি, আর ছুটি-ছাটার দিনে গলা ভেজাতে এক পাত্তর ভড্‌কা! গাঁয়ে থেকে ওগুলো আমি জুটোতে পারতুম না? এঁ্যা? তার জন্যই কি গাঁ ছেড়ে বিদেশে এসেছি চাকরি করতে? হুঁঃ, গাঁয়ে আরাম কত। সেখানে সকলে আমায় চেনে জানে মানে, দশজনের একজন আমি সেখানে···ঘরে সর্ব্বেসর্ব্বা। জমিদার

বল, জোৎদার বল্ আর বড় চাকুরে বল্, কার চেয়ে আমি ছোট ? কিন্তু এখানে ? পরের চাকর আমি। জমি নেই, ঘর নেই, দোর নেই, যতক্ষণ চাকরি, ততক্ষণ এই আস্তানাটুকু। চাকরি খতম হবার সঙ্গে সঙ্গে এ-চালা থেকে দেবে রদ্দা!

ইয়াকভ বললে,—কিন্তু এখানে পেট ভরে' তুমি খেতে পাচ্ছো, কাজও হালকা। তেমন খাটুনিও নেই!

ভাসিলি ফোঁশ করে উঠলো—এ-কথা আমি মানিনা। এক-এক সময় খাটুনির গুঁতোয় বলে, জিভ বেরিয়ে যায়! তার উপর ঝক্কি কম! তাছাড়া এখানে কাজ করতে হয় মনিবের হুকুম-মতো, মনিবকে খুশী করতে। আর গাঁয়ে কারো চাকর নই, সেখানে কাজ করি নিজের মর্জ্জিতে যখন যতটুকু দরকার, সেই দরকার বুঝে। এখানকার কাজে মনিবের লাভ, আর গাঁযে যতটুকু কাজ করবো, তার সবটুকুতেই আমার নিজের লাভ।

ইয়াকভ বললে,—পরের কাজ করলেও...এখানে তুমি পয়সা রোজগার করছো কত, বলো তো।

ভাসিলি তা বোঝে মনে-জ্ঞানে। জানে, কাজ গাঁয়ে দিনে-দিনে দুর্লভ হয়ে উঠছে। কিন্তু ইয়াকভের সামনে ইঙ্গিতেও তা স্বীকার করবে না। ইয়াকভ সেই ওজুহাতে এখানে থাকতে চাইবে! তাহলে ? তাই বেশ জোর গলায় ভাসিলি বললে,—এখানে কী দুশো পাঁচশো রোজগার করছি, শুনি ? হুঁঃ, আজ যদি গাঁয়ে থাকতুম...

মালভা আর চুপ করে' থাকতে পারলো না, মৃদু হেসে বললে,—তাবলে সেখানে সেই অন্ধকূপে মুখ গুঁজে থাকা ? বিশেষ আমরা... মেয়েরা যেভাবে থাকি, আমাদের তোমরা যে করে' রাখো, তাতে চোখের জল ছাড়া আমাদের কি আর সম্বল আছে, শুনি ?

মালভার পানে ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টিতে চেয়ে ভাসিলি বলে উঠলো,—মেয়েদের আবার এখান-ওখান কি রে! সেখানে চাঁদের জ্যোৎস্না নেই? না, রোদ নেই? সেগুলো আমরা পুরুষ-মানুষরা কেড়ে বাক্সে বন্ধ করে' রেখেছি?

মালভা উত্তেজিত হলো এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—ভুল করছিস ভাসকা! গাঁয়ের মেয়ে···বিয়ে তাকে করতেই হবে, তা সে বিয়েতে তার যত অনিচ্ছাই থাকুক। আর যেমন বিয়ে হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা হলো বাঁদী। ধান বাছো, গম ভাঙো, সুতো কাটো, গরু-বাছুরের সেবা করো, তাদের মাঠে চরিয়ে আনো...তার উপর রান্নাবান্না, জল তোলা, বাসনকোশন মাজা, কাপড়চোপড় কাচা···এর উপর যদি ছেলেমেয়ে হলো তো তার যত দায় পড়লো মেয়েদের ঘাড়ে! শুধু এই? তার নিজের বলতে কি থাকে, শুনি? না নিজের দেহ, না নিজের মন! না সুখ, না দুঃখ! ব্যথা পেলে দুদণ্ড বসে চোখের জল ফেলবে, সে-অধিকারও মেয়েদের নেই। এত যে আমরা করে' মরি, তার দরুণ একটা মিষ্টি কথাই কি ছাই পাই? পাবার বেলায় পাই শুধু কিল, চড়, ঘুষি, লাথি আর উঠতে-বসতে বাপান্ত গালাগাল।

ভাসিলি বললে,—শুধু পীড়ন অত্যাচারই নয়, মালভা ··

সে-কথায় কর্ণপাত না করে' মালভা বলতে লাগলো—আর এখানে? এখানে কারো তাঁবেদার নই আমি—নিজে নিজের মালিক। কারো হুকুম-কৈফিয়তের ধার ধারি না, তোয়াক্কা রাখি না। ঐ শীগল পাখিগুলো যেমন নিজেদের খুশী-মতো আকাশে এখানে-সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, আমিও তেমনি! প্রাণ যখন যা চাইছে, করছি, যেখানে খুশী যাচ্ছি, থাকছি—কেউ আমাকে না পারে আটকাতে, না পারে বাঁধতে।

একটু আগে যে ব্যাপার হয়ে গেছে, তা স্মরণ করে' ভাসিলি হাসলো; হেসে প্রশ্ন করলে,—আর যদি কেউ বাঁধতে চায়?

মালভা চাইলো ভাসিলির পানে, কণ্ঠ মৃদু করে' কোমল করে' বললে—সে হবে তার আস্পর্দ্ধা। আর সে আস্পর্দ্ধা ভাঙতে জানি আমি। কথাটা বলে' মালভা ছোট নিশ্বাস ফেলে দু'চোখ বুজলো।

ভাসিলি হো-হো করে' খানিক হাসলো; তারপর বললে—হুঁ... যতই তোরা ফোঁশ-ফোঁশ কর্ না কেন, তোদের জাতটাই হলো কম-জুরী, দুব্লা। মেয়েমানুষ... কথা কোস্ তাও মেয়েদের মতো! কথার মানে হয় না। গাঁয়ে চিরদিন দেখছি তো, আমার বয়স হলো পঞ্চাশের কাছাকাছি ···মেয়েরাই সংসারের মাথা···পুরুষের তারা কতখানি সহায়! পুরুষের বন্ধু... পরামর্শ দিতে, গোছগাছ করে' চালাতে মেয়েরা ছাড়া পুরুষদের গতি আছে? সেখানে সব বিষয়ে মেয়েরা যা করে, পুরুষ তাতে কথাটি কয় না। আর এখানে? মেয়েরা শুধু পুরুষের হাতে রঙীন খেলনা! পুরুষ তাকে নাড়বে-চাড়বে, নিয়ে খেলা করবে। মেয়েরা শুধু ভোগের জিনিষ, মেয়েদের নিয়ে পুরুষ যা খুশী করবে, তাতে টুঁ-বলা চলে না।

এই পর্য্যন্ত বলে' সে থামলো।

খানিক পরে মালভার কাণের কাছে মুখ এনে বেশ চাপা গলায় ভাসিলি বললে—পুরুষের পাপের সঙ্গিনী! পুরুষকে তোরা উচ্ছন্ন দিস্!

তার পর কারো মুখে কথা নেই খানিকক্ষণ; একটা নিশ্বাস ফেলে ইয়াকভ বললে,—ওঃ সমুদ্দুরের দিকে চেয়ে চেয়ে যত দেখছি, ততই ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে, এর আর শেষ নেই যেন।

এ-কথায় সকলে চোখ তুলে চাইলো সাগরের দিগন্ত-প্রসারী বিস্তারের দিকে।

ইয়াকভ বললে—বেশ আবেগ-ভরা কণ্ঠ—জল না হয়ে এর সবটা যদি মাটী হতো, আমাদের এই কালো মাটী...আর সে মাটীতে চাষ বাস করতে পারতুম !

ভাসিলি খুশী হলো, সোৎসাহে বললে—এই তো মানুষের মতো কথা। কালো মাটীর গুণ যে বুঝেছে, দুনিয়ার আর কোনো কিছুতে কি তার মন ভোলে রে !

বাপের উৎসাহ দেখে ইয়াকভের মন হলো ভারী···সে ভাবলো, এ-কথা শুনে বাপ যদি তাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দেয় ! বলে, যা, সেখানে গিয়ে লাঙল ধরে' মাটী চষ্।

ভাসিলি ভাবলো, চমৎকার হলো ! নিজের জালে বাছাধন ধরা দিলেন ! ..এই কথার জোরেই ওকে গাঁয়ে চালান দেওয়া সহজ হবে। ও ফিরে গেলে তারো অস্বস্তি ঘুচবে, আরামে থাকবে মালভাকে নিয়ে। তাই কথাটাকে সে জুড়োতে দিলে না, বললে,—ঠিক কথা বলেছিস ইয়াকভ, আমার অাঁতের কথা একেবারে···আমরা চাসা মাটীর ছেলে···মাটীই আমরা চাই। নিজের যদি খানিকটা মাটি থাকে, কে তাহলে পায় ? যতক্ষণ চাষ, ততক্ষণ শ্বাস। বলে, তোর লাঙল যদি যায়, তুই থাকবিরে কোথায় ? লাঙল গেলে চাষার সর্ব্বনাশ ! চাষা জন্মের মতো গেল তাহলে। যে-চাষার নিজের জমি নেই, সে তো বাজপড়া শুক্‌নো গাছ। না আছে তার ডালপালা, না ধরে তাতে ফুল-ফল ! একটু ছায়া দেবারও সামর্থ থাকে না, তার ! শ্রী নেই, কিছু নেই...জ্বালানি ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না। সত্যি রে, খুব খাঁটী কথা বলেছিস তুই।

অস্ত-সূর্য্যকে বিদায়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ করে' সাগর তুলেছে কল গুঞ্জন···আলোর দেবতা জীবের জীবন সূর্য্য বিচিত্র বর্ণ-রাগে হাসির জ্যোতি বিকীর্ণ করে' সাগরের কাছে শেষে বিদায় নিলে।

তিন জনে মুগ্ধ নয়নে দেখলো সে অপরূপ শোভা। ভাসিলি বললে মালভাকে,—জলের বুকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে দেখে আমার মন চিরদিন দোলে মালভা।

মালভা কোনো জবাব দিলে না।...ইয়াকভের নীল চোখে আনন্দের আভা...তিনজনের দৃষ্টি পশ্চিম-আকাশে নিবদ্ধ।

দিনের আলো নিবে গেল...সাগরের বুকে দূরে দূরে কখানা নৌকোয় ফুটলো আলোর শিখা...শীগলরা চলে গেছে...হল্‌দে রঙের বালির গায়ে কে যেন কালির আঁচড় বুলিয়ে দেছে! চারিদিক শান্তস্নিগ্ধ... স্বপ্নে আচ্ছন্নের মতো। যে ঢেউগুলো বালু-তটে এসে আছড়ে পড়ছে, সেগুলো যেন শ্রান্ত...তাদের গর্জ্জন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আসছে।

হঠাৎ মাল্‌ভা বলে উঠলো—বারে, আমি আর মিছিমিছি বসে কেন এখানে! যাবার সময় উৎরে গেছে।...

ভাসিলির বুকখানা ছাঁৎ করে' উঠলো। সে তাকালো ইয়াকভের পানে মৃদু কটাক্ষে; তারপর মালভাকে উদ্দেশ করে' বললে—এত তাড়া কেন? আর একটু থাক্!..চাঁদ উঠলে তখন যাস্'খন।

—চাঁদের জন্য বসে থাকবার কোনো মানে হয় না। মালভা বললে—অন্ধকারকে আমি ভয় করি না।...এমন অন্ধকারে তো এখান থেকে কত বার গেছি।

ইয়াকভ্‌ তাকালো বাপের পানে,—তারপর মাথা নামিয়ে একটু হাসলো—আবার তাকালো মালভার পানে। মালভাও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ইয়াকভের পানে তাকালো। চার চোখ মিললো। ইয়াকভ একটু অপ্রতিভ হলো মালভার দৃষ্টির স্পর্শে।

ভাসিলি বললে,—বেশ, তাহলে আর বসিস্‌নে মালভা, তুই যা।

যাওয়ার কথায় ভাসিলির মন হলো বিষাদে বেদনায় ভারী।

মালভা উঠলো, উঠে বিদায় নিয়ে ধীর পায়ে চললো জলের দিকে। ঢেউগুলো তাকে পেয়ে উল্লাসে যেন তার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে···খেলার সাথী পেয়ে যেন খেলায় মেতেছে! আকাশে অনেকগুলো নক্ষত্র, যেন সোনার ফুল জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

ওদিককার অন্ধকারে মালভার ব্লাউশের রঙ ক্রমে ঢেকে মিলিয়ে গেল। মালভা চলেছে দূরে...আরো দূরে···আরো আরো আরো দূরে। ভাসিলি আর ইয়াকভ নিঃশব্দে চেয়ে আছে তার পানে···দুজনের চোখে একাগ্র দৃষ্টি।

হঠাৎ মালভা দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে গান ধরলো··· গলা ছেড়ে গান। মালভা গাইছিল,—

এসো গো কাছে এসো
আমার প্রিয়তম,
সহে না দেরী আর—
এসো হে অনুপম!
তোমারে নিতে বুকে
মিলন-ঘন সুখে
অধীর আঁখি দুটি, ব্যাকুল হিয়া মম।

ভাসিলির মনে হলো, যেতে ওর মন চাইছে না···তাই দাঁড়িয়েছে। রাগও হলো···মনে-মনে গর্জ্জন তুললো, ডাকিনী···শয়তানী...এ শুধু আমাকে জ্বালানো!

মৃদু হেসে ইয়াকভ বললে ভাসিলিকে—গান গাইছে, শুনছো?

দুজনের চোখে মালভার ছবি অন্ধকারে মিলিয়ে মুছে গেছে···তাকে

দেখাচ্ছে অন্ধকারের গায়ে ছোট্ট একটু রেখার মতো! বাতাসে ভেসে আসছে শুধু গানের কলি—

মরাল দুটি ভাসে আমার বুকে দুলে
সোহাগে মুঠি ভরি ধরো গো ধরো তুলে,

—শুনছো? বলে' ইয়াকভ চেয়ে রইলো·· যে-দিক থেকে কুহকের সুর ভেসে আসছে, সেই দিকে।

ভাসিলি ভুরু কুঁচকোলো, তারপর ওদিক থেকে ইয়াকভের মনকে ফেরাবার মতলবে বললে,—সেখানে তুই সংসার চালাতে পারলি না? এ্যাঁ?

বাপের পানে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাকালো ইয়াকভ, কোনো জবাব দিলে না।

ঢেউয়ের সুরে মিলে মিশে গানের কটা কলি বাতাসে ভেসে আসছে। তার আর বিরাম নেই! দুজনে শুনলো

হায়রে, একা আমি, একা এ মধু রাতে
ঘুমের ছোঁয়া নেই, আমার আঁখি-পাতে

ভাসিলির সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা! ভাসিলি বলে উঠলো,—কি ভয়ানক গরম এখানে! ওঃ, রাত হলো তবু বালি তেতে আছে যেন আগুন। হতভাগা দেশ!

ইয়াকভ বললে সহাস কণ্ঠে—বালির জন্যই বুঝি তাত? ও! দিনের বেলা মনে হচ্ছিল যেন তপ্ত খোলায় পড়েছি! কণ্ঠ সরস করে কথাটা বললেও ইয়াকভের মন মিশে আছে ঐ গানে।

ভাসিলি বললে—হুঁ···এ-কথায় হাসলি যে?

—না। হাসিনি তো।

—হুঁ···খুব চালাক হয়েছো, দেখছি।

ইয়াকভ জবাব দিলে না। দুজনে নীরব ..কারো মুখে কথা নেই।

বাতাসে ভেসে আসছে গান। এখন আসছে সাগরের বুক থেকে অতি ক্ষীণ···অস্পষ্ট !..মনে হচ্ছে, গান নয় কার ব্যথার নিশ্বাস··· মনের আকুল আবেদন যেন!.

তারপর দু'হপ্তা কেটে গেছে। দু-হপ্তায় দুটো রবিবার এসে চলে গেছে।

ভাসিলি তেমনি বালির উপর উপুড় হয়ে পড়ে একাগ্র দৃষ্টিতে সাগরের দিগন্ত-রেখার পানে চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে সারাদিন, মালভার নৌকোর চিহ্ন দেখা যায়নি!..মালভা আসেনি। তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে অট্টহাসি তুলে ভাসিলিকে সাগর শুধু বিদ্রূপ করেছে! সাগরের বুকে সূর্যোর ছবি তেমনি হাজারখানা হয়ে ফুটেছে..ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে বালুতটে আছড়ে পড়েছে বেদনার সুরে, আবার ফিরে গিয়ে সাগরের বুকে মুখ লুকিয়েছে। ভাসিলির প্রহর কেটেছে একটির পর একটি ঢেউ গুণে! সে গুণেছে সাত হাজার আটশো ঢেউ! এত ঢেউ মিলে-মিশে মালভার নৌকোখানাকে ভাসিয়ে দুলিয়ে আনেনি ভাসিলির বুকের তীরে! সব ঠিক তেমনি ছিল...এই চোদ্দ দিনে কোথাও কিছুতে এতটুকু অদল বদল হয়নি। গেল-রবিবারেও ভাসিলির মনে বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ় সবল, মালভা আসবে। আজ কিন্তু সে বিশ্বাস আর নেই। বিশ্বাসের বদলে মনে আজ অধীর চাঞ্চল্য, অসহ্য অস্বস্তি! মালভার জন্য প্রাণ কতখানি আকুল...

মালভা তার প্রাণ।

দারুণ দুর্গ্রহ বিঘ্নের বেশে ইয়াকভ আর এখানে আজ আসবে না। সে চাকরি পেয়েছে, এখান থেকে অনেকখানি দূরে এক জেলের কাছে।

সেখানে মাছ ধরে, সেইখানেই তাকে থাকতে হয়। দুদিন আগে একবার এসেছিল একখানা জাল মেরামত করাতে। সেদিন বলে' গেছে, আজ রবিবারে সে যাবে সহরে নতুন একখানা জাল কিনতে। চাকরিতে তার মাহিনা বরাদ্দ হয়েছে মাসে পনেরো রুবল। রোজ জাল নিয়ে নৌকোয় করে মাছ ধরতে যায়···দিব্যি মনের খুশীতে আছে সেখানে। গায়ে মাছের গন্ধ···জেলেদের মতো নোংরা কানি পরে' বেরোয়···দুঃখ নেই, লজ্জা নেই তাতে।

ছেলের কথা মনে হতে ভাসিলির নিশ্বাস পড়লো। ভাসিলি ভাবলো, দু'পয়সা রোজগার করছে ছেলে, এখানে আর আসবে না ভাসিলিকে জ্বালাতন করতে! মালভার সম্বন্ধে ভাসিলির সঙ্কোচের আর এতটুকু কারণও থাকবে না। যেমন আরামে বাস করছে মালভাকে নিয়ে, তেমনি আরামে থাকবে।

কিন্তু না, হাজার হোক, ছেলে! এখানে কাঁচা পয়সার লোভে এই নোংরা কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে এর পর? ওর ভবিষ্যৎ যে জন্মের মতো মাটী হয়ে যাবে। না, যেমন করে হোক, ছেলেকে এখানকার চাকরি ছাড়িয়ে গাঁয়ের বাড়ীতে পাঠাতেই হবে। সেখানে নিজের জমি জমা ক্ষেত-খামার...সেগুলো গেলে আখের যাবে।

সাগরের বুকে জনপ্রাণীর এতটুকু সাড়া নেই...কোথাও একখানা নৌকোর চিহ্ন দেখা যায় না। শীগল, আর শীগল...শীগলের ঝাঁক! সূর্য্য উঠে বসেছে আকাশের মাঝামাঝি···রোদ নয়, গনগনে আগুন ছড়াচ্ছে যেন!

বেলা দুপুর···মালভা চিরদিন এসেছে দুপুরের অনেক···অনেক আগে! এ-সময়ের এতটুকু এদিক-ওদিক করেনি কোনো দিন।

আকাশে দুটো শীগলে লড়াই বেধেছে···জবর লড়াই। কটা

পালক খশে উড়তে উড়তে জলে পড়লো। কী ছুটোর চীৎকার! ঢেউয়ের মুখে মুখে যে কল-গুঞ্জন, সে গুঞ্জনের সুর কেটে চিরে গেল শীগল ছুটোর চীৎকারে। লড়তে লড়তে ছুটোই শেষে জড়াজড়ি করে পড়লো সাগরের জলে। জলে পড়েও তাদের ঠোকরাঠুকরির বিরাম নেই। জল থেকে আবার উঠলো আকাশে—আকাশেও তাদের যুদ্ধের মাতন। বাকী শীগলগুলো…পুরো একটা ঝাঁক তাদের দৃক্‌পাত মাত্র নেই সেদিকে · জলে নজর রেখে মাঝে মাঝে তারা মারছে ছোঁ—মাছের প্রত্যাশায়।

নিরালা নির্জ্জন চারিধার…সাগরের বুকে শুধু সফেন তরঙ্গমালা। যতদূর দেখা যায়, মালভার নৌকোর কোনো চিহ্ন নেই! দিগন্ত রেখার পানে চেয়ে ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে ভাসিলি ভাবলো, আজো এলো না মালভা! মন উঠলো ফোঁশ করে! আসিস নে, আসিস্ নে আর তুই! ভেবেছিস্…

মালভার উদ্দেশে সাগরের জলে থু-থু করে' থুথু ফেললো ভাসিলি। সাগরের দৃকপাত নেই! হাসির লহর তুলে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে তার বুকে।

ভাসিলি চালায় ফিরলো রান্না বান্না করবে বলে'। কিন্তু আহারে রুচি নেই—ইচ্ছাও নেই। তার সৃষ্টিটাই ওলোটপালট হয়ে গেছে।

আবার এলো সাগরের কূলে…নৌকোগুলোর আড়ালে ছায়া-করা তার সেই চিরদিনের জায়গাটিতে। বালির উপরে শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলো, সেরিওজকাটা আসতো যদি!

ভয়ানক মানুষ এই সেরিওজকা। তার নামে এখানকার সকলে আঁৎকে থাকে। লোকটা নিরেট, তা নয়; বিদ্যা-বুদ্ধি আছে। কাকেও গ্রাহ্য করে না। সব-সময়ে যেন মার-মুখী

হয়ে আছে ষাঁড়ের মতো। পাঁড় মাতাল···খায়ও তেমনি। দুনিয়ার কত জায়গায় ঘুরেছে, ওঃ! তবু ভাসিলি ভাবলো, সে যদি আসতো, যাহোক করে সময় কাটতো! মেয়েগুলো তার জন্য একেবারে পাগল! তুক্ জানে! ওর পায়ে পায়ে মেয়েগুলো ঘোরে, যেন কুকুর! মাল্‌ভাই শুধু সেরিওজকাকে ঘেঁষ্ দেয় না মোটে।

কিন্তু না, সত্যি, হলো কী? গেল-রবিবারে আসেনি। আজো তার আসবার নাম নেই? ভাসিলির উপর রাগ? সেদিন অমন মার তাকে মেরেছে ভাসিলি, তাই? কিন্তু অমন মার তার নতুন নয়! আগেও কত লোকের সঙ্গে প্রেমের খেলায় ওর চেয়ে ঢের বেশী মার খেয়েছে মালভা। তবে? ভাসিলির মার তার এমন অসহ্য হবে? বটে! ভাসিলির মারে এত অপমান!

চিন্তার পর চিন্তা। মনের মধ্যে যেন চিন্তার মালা গাঁথা চলেছে। একবার মালভার চিন্তা প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে, তার পর ছেলে ইয়াকভের চিন্তা···তারপর সেরিওজকা। মালভার চিন্তাই আর-সব চিন্তাকে ছাপিয়ে ওঠে।

ভাসিলি পড়ে আছে বালির উপর···এখনো মালভার আশা ত্যাগ করতে পারেনি। চিন্তার পটে ক্রমে সংশয়ের কালো বাষ্প···সংশয় থেকে নিবিড় সন্দেহ কালো মেঘান্ধকারের মতো মনে জমছে। প্রাণ-পণে সন্দেহের সে কালো মেঘগুলোকে ভাসিলি ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দেয়। মনকে জোর করে' বলে—না, না, সন্দেহ কিসের? এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিলি উঠে বসে—দু-চোখ সঙ্কুচিত করে' সাগরের সুদূর সীমারেখার পানে চেয়ে থাকে···কোথাও দেখা যায় না নৌকোর এতটুকু কালো বিন্দু!

সাগরের বুক থেকে দিনের আলো সরে সরে ক্রমে সন্ধ্যার

ছায়া ঘনালো। তবু সুদূর দিগন্তরেখার পানে ভাসিলি চেয়ে আছে আকুল চোখে···মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে,—আসবে, আসবে, মালভা আসবে।

এলোনা মালভা!

অনেক রাত্রে টলতে টলতে ভাসিলি ফিরলো নিজের চালা-ঘরটিতে, এসে বিছানায় লুটিয়ে দিলে শ্রান্ত দেহ। চোখে ঘুম নেই···তন্দ্রা আসে, বাহিরে একটু শব্দ হলেই সে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। ভাসিলি চম্‌কে ওঠে··· ভাবে, ঐ মালভা এলো। বিছানা ছেড়ে ছুটে আসে ঘরের বাহিরে··· কিন্তু কৈ, কোথায় মালভা?

চলে আসে বালির উপর দিয়ে একেবারে সাগরের কোলে।···মিষ-কালো অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা··আকাশের নক্ষত্রগুলো পর্য্যন্ত সে অন্ধকারে ঢেকে গেছে···চোখে পড়ে ছুটন্ত ঢেউগুলোর মুখের ফেনা আর কাণে আসে সাগরের গর্জ্জন··· তাকে উদ্দেশ করে সাগরের শ্লেষের অট্টহাসি! ভাসিলি ভাবে, সাগর তাকে অট্টহেসে বলছে—না রে না, মাল্‌ভা আজও এলো না।

দাঁতে দাঁত চেপে ভাসিলি মনে মনে গর্জ্জন তোলে,—হুঁ,—বেশ,··· তুই কত বড় শয়তানী, আমিও তোকে দেখে নেবো।

আক্রোশে বুক জ্বলছে···ভাসিলি ফিরে এলো ঘরে···এসে বিছানায় পড়ে জোর করে' দু'চোখ বুজলো···ঘুমের যেন মমতা হলো, ভাসিলির দু'চোখে সে আসন পাতলো।

এই রবিবারেই দিনের বেলায় আর একদিকে যা ঘটলো, বলি···

ভোরে ইয়াকভ এলো চালায়···ভাসিলি তখন ঘুমোচ্ছে। নিঃশব্দে ইয়াকভ বেরিয়ে এলো, সাগরে স্নান করবে বলে'। পুব-আকাশে উদয়-সূর্য্যের আভাস—সবে জেগেছে তখন আলোর আভাস! স্নিগ্ধ বাতাস···

সাগরের কূলে এসে ইয়াকভ দেখে, একখানা মাছ-ধরা নৌকোর পিছন দিকে হালের কাছে চুপটি করে বসে মালভা! নৌকোখানা ডাঙায় বাঁধা। নৌকোয় বসে মালভা চিরুনী দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে, তার পা দুখানা নৌকোর গায়ে ঝুলোনো।

মালভাকে দেখে ইয়াকভ থম্‌কে দাঁড়ালো · দাঁড়িয়ে মালভাকে দেখতে লাগলো নির্নিমেষ নয়নে।

মালভার গায়ে সুতির ব্লাউশ···বুকের বোতামগুলো খোলা··· কাঁধের উপর থেকে ব্লাউশ গেছে সরে'···কাঁধ-বুক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে··· হাতীর দাঁতের মতো ধপ্‌ধপে সাদা। নিটোল বক্ষযুগ···দেখলে মন মাতাল হয়ে ওঠে। ঢেউগুলো এসে নৌকোর পিছনে ধাক্কা দিচ্ছে। সে-ধাক্কায় নৌকো দুলছে।···সে-দোলনে মালভার দেহও একবার উপর-দিকে উঠছে পরক্ষণে নামছে নীচে···এত নীচে নামছে যে ঢেউয়ের জল তার দু'পায়ে লাগছে ছলাৎ-ছলাৎ করে'।

একখানি ছবি যেন! ইয়াকভ চঞ্চল হলো···চীৎকার করে মালভাকে বললে - তোমার চান হয়ে গেছে?

চমকে মালভা ফিরে তাকালো···কটাক্ষে বিদ্যুতের আলো ছিটিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মালভা বললে—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এত ভোরে উঠেছো যে?

ইয়াকভ বললে—আমার আরো অনেক আগে তুমি উঠেছো তো

—তাই আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে উঠেছো?

ইয়াকভ এ-কথার জবাব দিলে না।

মালভা বললে—আমাকে যদি এমন ভাবে মেনে চলো তাহলে তোমার মাথা বিগড়ে যাবে!

হো-হো করে' হেসে উঠলো ইয়াকভ···বললে—কি ভয়ানক মেয়ে মানুষ তুমি!

—হুঁ—তাই নাকি?

কথাটা বলে ইয়াকভ জলে নামলো।···স্বচ্ছ নির্ম্মল স্নিগ্ধ শীতল জল। আঁজলা ভরে জল নিয়ে ইয়াকভ ভালো করে' নিজের মুখ-হাত ধুলো, তার পর জামার হাতায় হাতের-মুখের জল মুছে মালভার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—আমাকে তুমি খালি খালি এত ভয় দেখাও কেন, বলো তো?

মালভা বললে—আর আমার পানে তুমি অমন হাঁ করে' চেয়ে থাকো কেন, বলো তো? কী ন্যাখো?

ইয়াকভ অপ্রতিভ হলো। এখানকার জেলেপাড়ার অন্য মেয়েদের পানে যেমন করে সে তাকায়, মালভার পানে তেমন ভাবে কৈ, তাকিয়েছে বলে' তার মনে পড়ে না, তো! তবু কেমন লোভ হলো একটু... হেসে ইয়াকভ বললে—যে-রকম মন-মজানো চেহারা তোমার, তোমার পানে না চেয়ে থাকা যায়?

বাঁকা কটাক্ষে ইয়াকভকে বিঁধে মালভা বললে,—ইস্ খুব রসিক হয়েছো, দেখছি। মোদ্দা সাবধান তোমার বাবা যদি তোমার এই রনালো কথা শোনে, তাহলে তোমাকে আর আস্ত রাখবে না!

হো-হো করে' হেসে ইয়াকভ উঠে বসলো মালভার নৌকোয়। মনে সাহস হলো···ভাবলো, মালভা যখন তার দৃষ্টিতে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছে এবং ইয়াকভের সে-দৃষ্টি যখন মালভার মন্দ লাগেনি...

এগিয়ে একেবারে মালভার গা ঘেঁষে সে বসলো...বসে মালভার পানে চেয়ে ইয়াকভ বললে,—বাবা যদি জানতে পারে···কী? তা হলে, কী হবে, শুনি?

মালভা বললে,—কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও তো···

—কি কথা ?

ইয়াকভ বললে—বাবা তোমাকে কিনে রেখেছে বাঁদীর মতো ?

মালভা জবাব দিলে না ; চেয়ে রইলো ইয়াকভের পানে।

ইয়াকভ বললে,—বলো···

মালভার পাশে বসে মালভার খোলা কাঁধের উপর থেকে ইয়াকভের চোখ আর ফিরতে চায় না ! সুগোল সুডৌল গলা ..ইচ্ছা হলো দু'হাতে মালভার ঐ গলাটা জড়িয়ে ধরে ! সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়লো উন্নত বক্ষযুগের পানে···ব্লাউশের বোতাম খোলা···বক্ষ-যুগ দেখাচ্ছে সদ্য ফোটা দুটি সাদা পদ্ম যেন···তেমনি নিটোল, টাইট !

বিহ্বল কণ্ঠে ইয়াকভ বললে—আশ্চর্য্য তোমার গায়ের রঙ··· যাকে সত্যিকারের সুন্দরী বলে। তুমি দেখছি ডাকের সুন্দরী। এমন রঙ আমি কখ্খনো দেখিনি।

ইয়াকভের পানে না চেয়ে শ্লেষ ভরে মালভা বললে—আমার এ-রঙ কিন্তু তোমার জন্য নয়···মনে রেখো। জানো তো, কথায় বলে, বেল পাক্‌লে কাকের কী !

মুখে এ-কথা বললেও মালভা কিন্তু গায়ে আবরণ টানলো না। ইয়াকভ নিরুত্তর···শুধু একটা বড় নিশ্বাস ফেললো।

দুজনের সামনে দিগন্ত-প্রসারী অপার অতল সাগর···প্রভাত-সূর্য্যের কনক কিরণে অপরূপ শোভায়-শ্রীতে ভরে উঠেছে। ছোট ছোট ঢেউ গুলো ডাঙ্গায় এসে পড়ছে···সাগরের আশ্চর্য্য একটা গন্ধ বাতাসে মেশা। ঢেউয়ের দোলায় নৌকোখানা দুলছে। অনেক দূরে সাগরের বুকের দিকে এক-ফালি ডাঙ্গা এগিয়ে গেছে···জলের বুকে সেই ফালি-

টুকুকে দেখাচ্ছে যেন কালো লাইন টানা। মাথার উপর আকাশ নীল নির্ম্মল···জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই...এতটুকু চিহ্ন নেই কারো··· নির্জন তীর-ভূমি। পিছন-দিকে ভাসিলির চালা-ঘরের মটকায় উড়ছে খুঁটীতে বাঁধা সেই লাল কানিখানা···নিশানের মতো।

ইয়াকভের পানে না চেয়েই মালভা বলতে লাগলো—আমাকে দেখে সবার মন ভোলে তা আমি জানি। কিন্তু তোমার মন ভুললে তো চলবে না। আমার এ-রূপ তোমার জন্য নয়, বুঝলে! আমাকে দাম দিয়ে কেউ কিনে রাখেনি। তোমার বাপের সঙ্গেও আমার এমন বাঁধা-বাঁধি কোনো সর্ত্ত নেই, যার জোরে আমার উপর তোমার বাপ যেমন-খুশী দখল চালাবে। বুঝলে, আমি যেমন খুশী চলবো, যা ইচ্ছা হবে করবো, তাতে বাধা দেবে, এমন মানুষ সারা দুনিয়ায় নেই, তোমার বাপ কোন্ ছার! তবু আমার সঙ্গে তুমি যেন প্রেম করতে এসোনা। বাপে-ছেলেতে এতটুকু কচ্‌কচি হতে দেবোনা আমি। আমাকে নিয়ে কেউ ঝগড়া-বিবাদ কি মারামারি করবে, তা আমার সহ্য হবে না বুঝলে?

ইয়াকভের বিস্ময়ের সীমা নেই। সে বললে,—কিন্তু এত কথা আমাকে বলার মানে? আমি তোমাকে জড়িয়ে বুকে নিতে গেছি? না, তোমার গায়ে হাত দিতে চেয়েছি? তোমাকে পাবার লোভে আমি ক্ষেপে উঠেছি; এমন কথা ঘুণাক্ষরে আমি জানাইনি।

শ্লেষ-ভরে মালভা বললে—সে সাহস তোমার আছে না কি?

মালভার কথায় দারুণ অবজ্ঞা! সে-অবজ্ঞায় ইয়াকভের পৌরুষ তুললো তার বুকের মধ্যে আক্রোশে গর্জ্জন। মালভা ভাবে কি? ইয়াকভ পুরুষ-মানুষ নয়? তার মনে জাগলো দুষ্ট অভিসন্ধি। মালভা তার

এত কাছে···একেবারে পাশে! নাগালের মধ্যে! তার উপর এমন নির্জ্জন জায়গা···কেউ কোথাও নেই।

মালভার পানে তাকালো ইয়াকভ···মালভার নিটোল দেহ···বোতাম খোলা ব্লাউশের ফাঁকে বুকের যেটুকু···

দুর্জ্জয় লোভে সে মাতাল হয়ে উঠলো। স্থান-কাল-পাত্রের কথা ভুলে গেল ইয়াকভ···পৃথিবী ভুলে গেল—আকাশ সাগর মা-বাপ সব সে ভুলে গেল ..চোখদুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠলো! মালভার আরো গা ঘেঁষে বসে মালভার একখানা হাত নিজের হাতে খপ্‌ করে' ধরে' সে বললে,—কি? কি বললে? সাহস নেই আমার? আর একবার বলো, শুনি!

সদর্পে মালভা বললে,—না·· নেইই তো তোমার সাহস।

—নেই—বটে?

—করবে কি?

ইয়াকভ বললে,—তোমার গা যদি এখন ছুঁই?

—ছুঁয়ে একবার গ্যাখোনা···কি হয় তার ফল।

—কি আবার হবে?

মালভা বললে—তোমার ঘাড় ধরে' ঐ বালিতে দেবো আছাড়।

—হুঁ! বেশ —পারো যদি, তাই করো, দাও আমাকে আছাড়। এ-কথা বলে সে নিজের জামার আস্তিন গুটোলো।

মালভা ফোঁশ করে' উঠলো.—খবর্দ্দার বলছি...আমার গায়ে তুমি হাত দেবে না।

মালভার সে-ভর্ৎসনা, চোখের সে অগ্নিশিখা···ইয়াকভের নেশা লাগলো! শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে উঠলো! তার দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মালভার নগ্ন রূপ-মাধুরীর জৌলুশে ··দুহাতে

মালভাকে জাপটে তাকে বুকে চেপে ধরে' ইয়াকভ মালভাকে পিষে ফেলবে যেন! মালভার যৌবন-পুষ্ট নিটোল অঙ্গের স্পর্শ ইয়াকভকে চকিতে তাতিয়ে তুললো, মাতিয়ে তুললো···তার নিশ্বাসে আগুন ছুটচে! রুদ্ধ স্খলিত কণ্ঠে ইয়াকভ বলতে লাগলো—কেমন! সাহস নেই আমার···না? ধরো, ধরো আমার ঘাড়, ধরো···ধরে' তুলে আমাকে আছাড় দাও! দাও···দাও আছাড়···

বলতে বলতে মালভাকে সে আরো পিষছে। মালভা চ্যাঁচাচ্ছে, —আঃ, ছাড়ো ছাড়ো···আমাকে ছাড়ো ইয়াকভ। সত্যি, ভালো হবেনা।

—না, আমি ছাড়বো না। কেন, তুমি আমাকে ধরে' আছাড় দেবে যে! দাও, দাও আছাড়।

চোখের সামনে আঙুরের মতো তাজা রসালো মালভার রাঙা দুটি ঠোঁট···সে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে ইয়াকভের অজস্র চুম্বন বর্ষণ!

দু-হাতে ইয়াকভকে ঠেলতে ঠেলতে মালভা বললে,—ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো···আমাকে যেতে দাও ইয়াকভ, না হলে তোমার ভালো হবে না! সত্যি ভালো হবে না।

—দেবো ছেড়ে···আগে বলো, আমাকে আর কখনো ভয় দেখাবে না!

—বারে, কখন তোমাকে ভয় দেখালুম আমি?

ইয়াকভ সে-কথার জবাব দিলে না। মালভাকে বুকে চেপে তার মুখখানাকে তুলে ধরে' মুখে বিহ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' আবেগ-ভরা কণ্ঠে ইয়াকভ বললে—সত্যি, কি রঙ! এ রঙে মানুষ পাগল হয়!

কথার সঙ্গে মালভার অধরে আবার চুম্বন···আবেগ-ভরা অজস্র চুম্বন।

মালভার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে! ঝাঁকানি দিয়ে দু'হাতে ইয়াকভের হাত দুখানা চেপে ধরে' মালভা তাকে প্রায় শুইয়ে দিলে। তারপর

ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি হুড়োহুড়ি··· শেষে নৌকোর উপর থেকে ঝুপ্‌ করে দুজনে পড়লো জলে।

জলে পড়েও কেউ কাকে ছাড়ে না! ফেনিল উচ্ছল জলে দুজনের কী মাতন! জল খেয়ে দুজনেই একশা...সমানে চুবন খাচ্ছে!

একটু পরে মাথা তুলে ইয়াকভ ভেসে উঠলো···উস্কোখুস্কো চেহারা··· ইয়াকভকে দেখবামাত্র মালভা তার মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে তাকে বিপর্য্যস্ত করে' তুললো। হাঁফিয়ে ইয়াকভ চ্যাঁচায় এবং মালভা তাকে ঘিরে সাঁতার কাটে, আর ইয়াকভের মুখে জোরে জোরে জল ছিটোয়। কি হাসি মালভার! সে হাসির রোলে মালভা যেন ফেটে পড়বে! আকাশ বাতাস তার হাসির ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠছে!

নাকের মুখের জল ঝাড়তে ঝাড়তে ইয়াকভ চ্যাঁচায়, বলে,—রাক্ষুসী পোড়ারমুখী, ওরে আমি ডুবে মরবো এখনি। থামো, থামো ঢের হয়েছে। তোমার জিত্‌···সত্যি, আমি হার মান্‌ছি। থামো, থামো, নাকে মুখে লোনা জল ঢুকে আমার প্রাণ যায়···সত্যি হাত পা ঝিমিয়ে আসছে, আমি···আমি···আমি···

ইয়াকভ জলে চুবন খাচ্ছে···মালভা ওদিকে ইয়াকভকে ছেড়ে সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলেছে...ইয়াকভের পানে তাকালো না।

তীরে উঠে মালভা বসলো আবার সেই নৌকোখানার উপর। একটু বসে থেকে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে দেখে, ইয়াকভ চুবন খাচ্ছে···চুবন খেতে খেতেই তার কি প্রয়াস তীরে ফেরবার!

মালভা হা-হা অট্টহাসি জুড়ে দিলে। ইয়াকভের নাকে মুখে জল

ঢুকছে। মাথা তুলে সে নিশ্বাস নিচ্ছে। ইয়াকভ আসছে মালভার নৌকোর দিকে।

মালভা নৌকোয় দাঁড়িয়ে···গায়ে ভিজে জামা। স্কার্টটা গায়ে সেঁটে বসেছে। জলে চুবন খেতে খেতে ইয়াকভ চেয়ে আছে মালভার দিকে। মালভার মূর্ত্তি দেখে তার দেহ-মন লোভে আতুর! কোনোমতে নৌকোর কাছে এসে নৌকোটাকে ধরে জলেই সে দাঁড়ালো। মালভার বিহ্বল-করা মূর্ত্তির পানে পিপাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো···মালভার অঙ্গের মাধুরীর উপর থেকে চোখ তার ফিরতে চায় না!

মালভা লক্ষ্য করলো ইয়াকভের চোখের সে পিপাসাতুর দৃষ্টি... ইয়াকভ চেয়ে আছে তার আবরণ-মুক্ত অঙ্গের পানে। মালভা অঙ্গ আবৃত করলো না। গর্ব্ব বোধ করে' হাসতে লাগলো; এবং হাসতে হাসতেই নিজের একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে ইয়াকভের দিকে, দিয়ে বললে—ভিজে বেড়াল এলো যেন! নাও, আমার হাত ধরো, ধরে' ওঠো নৌকোর উপর।

এ-কথা বলে প্রসারিত হাতে হাঁটু গেড়ে মালভা নীচু হয়ে বসলো—ইয়াকভের নাগালে। ইয়াকভ ধরলো মালভার হাত..মালভা টেনে তুললো ইয়াকভকে।

নৌকোর উপরে উঠে মালভার সে-হাত ইয়াকভ ছাড়লো না। বেশ জোরে চেপে ধরে'...দৃষ্টিতে ফন্দীর হাসি···ইয়াকভ বললে,—এবার আমি যদি তোমাকে ধরে' এখন চুবন দিই?

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মালভাকে বেশ বাগিয়ে জড়িয়ে ধরে' তাকে নিয়েই ইয়াকভ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জলে পড়ে মালভার মুখে-চোখে জোরে জোরে জল ছিটুতে লাগলো। দু-হাতে আবরণ রচে' ঘাড় ফিরিয়ে

মালভা চেঁচাচ্ছে,—আঃ, করো কি···করো কি ইয়াকভ! ভালো হচ্ছে না কিন্তু···

ইয়াকভ হো-হো করে' হাসছে আর সবেগে জল ছিটোচ্ছে··· তিলেক বিরাম নেই।

হঠাৎ অতর্কিতে ঘুরে মালভা সবেগে দিলে ইয়াকভকে ধাক্কা··· ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে ইয়াকভ জলের নীচে তলিয়ে গেল।

তারপর আবার ছজনে তেমনি ঝটাপটি...ভয়ানক মাতন! সে-মাতনে সাগর চঞ্চল উচ্ছল হলো···ছজনের চীৎকার···হাসি···জল-ছোড়াছুড়ি!

আকাশের বুকে সূর্য্য অনেকখানি এগিয়ে বসেছে···জলের বুকে কিশোর-কিশোরীর প্রেমের রঙ্গ দেখছে যেন! দূরে ভেড়ির ইজারাদারের অফিস-ঘরের সার্শিগুলোর কাঁচে পড়েছে সূর্য্যের কিরণ··· মনে হচ্ছে কাঁচগুলো যেন এদের রঙ্গ দেখে হাসিতে ঝক্‌ঝক্ করছে! জলের বুকে ছজনের প্রমত্ত মাতন দেখে শীগলগুলো ভয় পেয়ে উড়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে ছজনের শ্রান্তির ঘোর...যুদ্ধ শেষ হলো।

হাঁফাতে হাঁফাতে এক পেট করে' নোনা জল খেয়ে ছজনে গুঁড়ি মেরে ডাঙ্গায় উঠে বসলো.. ছজনেরই নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসবে!

কোনোমতে নিশ্বাস ফেলে ইয়াকভ বললে—বাস রে, কি ভয়ানক নোনা এখানকার জল! ওঃ, পেটটা আমার নুনের গোলা হয়ে উঠেছে। এই বিশ্রী নোনা-জল কতখানি যে পেটে গেছে!

মালভা বললে,—জলই শুধু বিশ্রী? তোমার মতো ছোকরারা এ জলের চেয়ে ঢের বেশী বিশ্রী আর নোনা। একেবারে অসহ্য!

কথাটা বলে বাঁকা কটাক্ষের বাণে ইয়াকভকে মালভা বিঁধলো।

জলে চুবন খেয়ে ক্লান্তিতে মালভার অঙ্গে মাধুরী বেড়েছে আরো

দশগুণ যেন! তার পানে বিভোর চোখে চেয়ে ইয়াকভ বললে—তোমায় দেখে পাথরের পাহাড় পর্য্যন্ত মেতে ওঠে, আমার বাপ বুড়ো মানুষ, এ-বয়সে সে হবে মশগুল, এ-আর আশ্চর্য্য কি!

কথাটা বলে' মালভার পিঠে ইয়াকভ কনুইয়ের একটা ছোট গুঁতো মারলো।

কথাটা মালভার ভালো লাগলো ভ্রূযুগ বাঁকিয়ে মালভা বললে,—থামো, থামো, তোমার বয়সী ছোকরাদের চেয়ে বুড়ো মানুষরা ঢের বেশী সোহাগ জানে।

ইয়াকভ বললে,—বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া, কুছ নেহিতো থোড়া থোড়া! বাপের সোহাগের পরিচয় পেয়েছো···বাপকা-বেটার সোহাগ কেমন, পরিচয় নিয়ে একবার দেখবে না কি?

—ইস্ ভারী আস্পর্দ্ধা দেখছি! এমন রসিক হলে কি করে'?

ইয়াকভ বললে—আমাদের গ্রামে মেয়ে নেই, ভাবো? তোমার বয়সী মেয়ে···এমনি রঙের জেল্লা? হুঁ...অঢেল···কত চাও? আমাকে তারা কি বলে, জানো? বলে, তুমি খাশা দেখতে ইয়াকভ!

—গাঁয়ের মেয়েদের নজর, আর গায়ের মেয়েদের পছন্দ ···হুঁঃ!

—শালুক চিনেছে মাকাল-ঠাকুর! তুমি দেখতে কেমন···সে কথা আমাকে বরং জিজ্ঞেস করো···

—কিন্তু তুমি তো মেয়ে নও ···তুমি হচ্ছো মেয়ের মা!

রুক্ষ কঠিন চোখে মালভা তাকালো ইয়াকভের পানে ..তারপর হঠাৎ গম্ভীর হলো তার মুখ। নিশ্বাস ফেলে মালভা বললে—হুঁ...একটা ছেলে আমার হয়েছিল, সত্যি।

—ও···তাহলে বুদ্দি। ·· এ কথা বলে' ইয়াকভ হা-হা করে হেসে উঠলো।

—চালাকি করোনা···তুমি যাও। ইয়াকভের কাছ থেকে একটু সরে' ঘুরে বসলো মালভা।

বেকুবের মতো তার পানে চেয়ে ইয়াকভ বসে রইলো...নির্বাক।

প্রায় আধ-ঘণ্টা···কারো মুখে একটি কথা নেই। রোদে দুজনের গায়ের কাপড় চোপড় শুকিয়ে উঠেছে।

দূরে দূরে জেলেদের ঘরগুলো...এতক্ষণ সে ঘরগুলো ছিল ঘুমে অচেতন! ও সব ঘরে ধীরে ধীরে মানুষের সাড়া জাগছে···কালো কালো ছায়ার মতো কী কতকগুলো নড়ে বেড়াচ্ছে···দূর থেকে ওদের দেখাচ্ছে একই রকম···জীর্ণ বেশ···নোংরা কালি ঝুল···পায়ে কারো জুতো নেই!

সাগরের বালু-তীর মানুষের কলগুঞ্জনে ভরে উঠলো। খালি পিপে গুলোতে কে মুগুরের ঘা মারছে···সে শব্দ বাতাসকে চিরে চিরে দিচ্ছে ...ঢাকের বাদ্যির মতো। ওদিকে কোন্ পাড়ায় মেয়েদের দারুণ ঝগড়া সুরু হয়েছে···কর্কশ চীৎকারে বাতাস ভারী।

ইয়াকভ বললে—সকলে জেগে উঠলো। আজ সকালে আমার সহরে যাবার কথা, জরুরী কাজ ছিল, তোমার পাল্লায় পড়ে আর যাওয়া হলোনা।

মালভা বললে—আমি তোমাকে ডেকে বলেছি যে এখানে বসো গো···যেয়োনা · বটে?

মৃদু হেসে ইয়াকভ বললো—ডাকোনি ঠিক, কিন্তু এই নিরালা··· কেউ কোথাও নেই ··তার মধ্যে তোমার এই চেহারা! এ দেখে সাধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যানধর্ম্ম ভুলে স্বর্গ ভুলে মশগুল হয়ে দাঁড়ায়, আমি তো জোয়ান বয়সী তাজা মানুষ! হুঁঃ, আমার জরুরি কাজ পণ্ড হলো।

—বেশ হয়েছে। যেমন গা ঘেঁষে প্রেম করতে আসা! আমি

খুব খুব খুব খুশী হয়েছি। বলে, আমার পাল্লা! ওঁর জন্য আমি যেন আসর সাজিয়ে বসেছিলুম···খেলে যা!

চোখে বিলোল দৃষ্টি···ইয়াকভ বললে,—আবার জ্বালাতন করছো! কথাটা বলে ইয়াকভ সরে মালভার গা ঘেঁষে বসলো।

ধমক দিয়ে মালভা বললে.—খবর্দ্দার। চারদিকে লোকজন···বেই-জ্জৎ করোনা,বলছি। তোমার বাবার কাণে যদি তোমার কীর্ত্তির কথা পৌঁছোয়···

বাপের নামে ইয়াকভ যেন ক্ষেপে উঠলো! বললে,—আরে রাখো তোমার বাবা! হ্যাঃ, বাবা আমার কি করবে শুনি? আমি এখনো কচি খোকাটি আছি, বটে? বাবা বাবাই আছে···তা বলে সবতাতে মুড়ুলী করতে এলে বাবাকে মানছে কে? বিশেষ এখানে? এখানে আমিও বাবার মতো স্বাধীন। গাঁয়ে হলে খানিকটা পরোয়া করতে হতো। এখানে বাবার কি তোয়াক্কা রাখি আমি! আমার কপালের নীচে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আছে বিবি-সাহেব, বুঝলে! আমি সব বুঝি। বাবা যদি যা খুশী করতে পারে এখানে, আমিই বা পারবো না কেন? আসুক তো দেখি বাবা বাধা দিতে···হুঁ···

সকৌতুকে ইয়াকভের পানে চেয়ে মালভা শুনলো ইয়াকভের গভীর তত্ত্বকথা। তার পর কৌতূহল-ভরে বললে,—তোমাকে তোমার বাবা বাধা দেবে না, তার মানে? কিসে বাধা? কি তুমি করতে চাও এখানে?

—কি আমি করতে চাই, দেখবে? বলে বুকখানাকে চিতিয়ে ইয়াকভ আবার বললে,—অনেক কিছু করতে চাই। গাঁয়ে থাকতে আমার মনে যে সব ভয়, ভালো-মন্দর হিসেব, আর লজ্জা-সরম ছিল, এখানকার এই লোণা বাতাসে তার সব গেছে ঝরে' নিশ্চিহ্ন হয়ে।

ঠোঁট উল্‌টে বিদ্রূপ-ভরে মালভা বললে,—লোণা বাতাসের এত গুণ! সে বাতাসে গেঁয়ো ভূত রাতারাতি মানুষ হয়ে ওঠে!

—নিশ্চয়…হয়ই তো! সোৎসাহে ইয়াকভ বললে—বাজি রাখো, বাবার হাত থেকে তোমাকে আমি যদি চোখের পলক-না পড়তে ছিনিয়ে নিতে না পারি!

—বটে! আমি তোমাদের জালের মাছ…না? এর জাল থেকে ওর জালে তুলে নিলেই হলো!

—তুমি ভাবো, আমি ছিনিয়ে নিতে পারি না?

—না…না…না…পারো না।

—হুঁ, ভাখো তবে। এ-কথা বলে বিহ্বল দৃষ্টিতে মালভার পানে সে চাইলো।

দু-মিনিট। তার পর ইয়াকভ বললে,—আমার সঙ্গে লেগো না, খেপিয়োনা আমাকে, সত্যি। লাগো যদি…বুঝলে…

ইয়াকভের চোখে আবেশের দৃষ্টি।

—কি বুঝবো…শুনি, ওঃ, আমার দিগ্বিজয়ী সেকন্দর শা রে!

—আবার?

—কি আবার?

—কিছু না…

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে ইয়াকভ একটু দূরে সরে বসলো—কোনো কথা বললে না।

মালভার সাহস আর বিশ্বাস অনেকখানি।

মালভা বললে,—কথার জাহাজ তুমি। ভেড়িওলার একটা কুকুর ছানা আছে…দেখেছো? কুচকুচে কালো রঙের বাচ্ছা। তুমি ঠিক সেই

কুকুর ছানাটার মতো। মানুষ দেখলে ছানাটা দূর থেকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে, তড়পায়, কাছে যাও, অমনি ল্যাজ গুটিয়ে কোথায় পালাবে, খুঁজে পায় না! তুমি ঠিক সেই কালো কুকুরছানা!

ইয়াকভ ফোঁশ করে উঠলো! ঝাঁজালো গলায় বললে,—সবুর করো …আমি কুকুরছানা, কি, কিসের ছানা, তোমাকে হাড়ে হাড়ে মালুম করিয়ে দিচ্ছি।

তাচ্ছিল্যভরে মালভা হো-হো করে হেসে উঠলো।

কে একজন আসছে এ দিকে…দীর্ঘ দেহ, জীর্ণ বেশভূষা…গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে…মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি…অত্যন্ত রুক্ষ চেহারা।

হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে মানুষটা কাছে এলো। গায়ে লাল রঙের একটা ব্লাউশ কোট…কোমরের পেটিটা গেছে ছিঁড়ে,—জামার হাতা গুটোনো…পাঁৎলুনে শত জোড়াতালি! নানা জাতের নানা রঙের ন্যাকড়ার তাল, পায়ে জুতো নেই…চোখে বাঘের মতো হিংস্র দৃষ্টি। দেখলে মনে হয় বেপরোয়া গুণ্ডা-জাতের মানুষ।

নৌকোর কাছে এসে মানুষটা থমকে দাঁড়ালো…তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকালো ..তার পর সহজ ভাবে সামনে এসে ইয়াকভকে উদ্দেশ করে বললে—পেট ভরে' কাল দেদার মদ গিলেছি। পকেট কাল ছিল ভর্ত্তি…মদের ঢেউয়ে ধুয়ে পকেট আজ একেবারে গড়ের মাঠ, বাবা…ভলা-ফুটো বোতল বললেও বলতে পারো…

তার পর একখানা হাত ইয়াকভের সামনে প্রসারিত করে ধরে বললে—দাও দিকিনি কুড়িটা কোপেক আমার এই হাতে…চট্‌ করে'…

ইয়াকভ অবাক! যেন আকাশ থেকে পড়েছে, চোখে তার এমনি দৃষ্টি!

হো-হো করে হেসে মানুষটা বললে,—ধার গো, ধার, ভিক্ষা দিতে বলচি না…এ ধার মোদ্দা কখনো শুধবো না বাবা, আগে থেকে বলে রাখছি।

মানুষটার পা টলছে…মুখে বিশ্রী মদের গন্ধ।

ইয়াকভ হো-হো করে হেসে উঠলো। মালভাও হাসলো। কিন্তু অতি মৃদু অস্পষ্ট তার হাসি…কোনো কথা বললে না মালভা।

হাত তেমনি প্রসারিত…সেরিওজকা বললে,—ছাড়ো বাবা, ছাড়ো চট্‌পট্…এর আবার ভাবছো কি? বেশী চাইনা…কুড়িটি মাত্র কোপেক। তোমাদের চার হাত এক করে এখনি বিয়ে দিয়ে দেবো গো চাঁদমণিরা!

ইয়াকভ বললে,—ও তুমি বিয়ের মন্ত্র পড়াবে! আচার্যি ঠাকুর!

—আবার ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে! দাও, দাও, দাও। জানো, আলিচের গির্জ্জেয় দু'মাস আমি বেয়ারার কাজ করেছিলুম…হুঁ, হুঁ, জানি বৈ কি মন্তরতন্তর! এখন ছাড়ো বাবা কুড়িখানি কোপেক!

ইয়াকভ বললে,—কিন্তু আমি তো বিয়ের জন্য আকুল নই আচাযি্য ঠাকুর।

—তাতে আমার কি বয়ে গেছে! টাকা আমার চাই। নাও, নাও, দিয়ে ফ্যালো। ভয় নেই হে ছোকরা…তোমার বাপকে বলবো না, বাপের মেয়েমানুষকে নিয়ে সকালেই তুমি এখানে আসর জমিয়েছো! বুঝলে! দাও, দাও কোপেক-ক'টা চট করে' দাও! বলে সেরিওজ্কা আঙুলে তুড়ি বাজাতে লাগলো।

ইয়াকভ বললে—দাও গিয়ে আমার বাবাকে বলে। বাবা তোমার কথা বিশ্বাস করলে তো!

—আলবৎ করবে! আর বিশ্বাস করে' তোমাকে কোলে তুলে নাচাবে না মোদ্দা তোমার বাবা।

ইয়াকভ বললে—বাবাকে আমি থোড়া কেয়ার করি!

—ও। তাহলে আমায় নাচাতে হলো দেখছি।

কথাটা বলে সেরিওজকা ভূরু কুঁচকে বিভঙ্গ দৃষ্টিতে তাকালো ইয়াকভের পানে। সে দৃষ্টিতে ইয়াকভের বুক কেঁপে উঠলো। এখানে এসে এ লোকটার কথা দু চারজনের কাছে শুনেছে···ভয়ানক নাকি বেপরোয়া। পয়সা চেয়ে না পেলে খুন করতে ওর বাধে না! বেশী নয়, চাইছে কুড়িটা মাত্র কোপেক! কাজ কি ওকে ঘাঁটিয়ে? দেওয়া যাক্। ইয়াকভ আর কোনো কথা না বলে কুড়িটা কোপেক দিলে সেরিওজকার হাতে।

কোপেকগুলো ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুম্বন করে সেরিওজকা বললে—এই তো বাবা লক্ষ্মীছেলের কাজ! এখানে যখন এসেছো, আমাকে মেনে চলবে · যখন যা বলি···বুঝলে! তাহলে তোমার বুদ্ধিও খুলবে, আর তোফা আরামে এখানে থাকবে।···হ্যাঁ, আর তুই?

সেরিওজকা তাকালো মালভার পানে, তাকিয়ে বললে—আমাকে কবে তাহলে বিয়ে করছিস, বল...মন ঠিক করে ফ্যাল্। বিয়েটা আমি আর ফেলে রাখতে চাই না, বুঝলি! আমার আর সবুর সইছে না।

মালভা চোখ রাঙিয়ে উঠলো···বললে—খেলে যা! আস্পর্দ্ধা তোর কম নয়। কাণিপরা পথের ভিখিরী···দাঙ্গাবাজ মাতাল···উদ্ খেতে খুদ্ নেই, বাতাসে নড়ে হাঁড়ি···ওঁর সখ হয়েছে, আমাকে বিয়ে করবেন! আমি ওঁর ছেড়া প্যাংলুনে তালি দেবো···দাড়ি চেঁছে দেবো···মাথার উকুন

বাছবো…বাঁদীগিরি করবো ওঁর ঘরে গিয়ে। অভাগ্যির দশা আমার!

পাঁৎলুনের জোড়া তালিগুলোর উপর নজর বুলিয়ে সেরি-ওজ্কা বললে—দে না আমাকে তোর একটা ঘাগরা…তা পেলে কি তালিমারা পাঁৎলুন পরি!

—কী! মালভা গর্জ্জে উঠলো।

—তোর একটা ঘাগরা চাইছি। সত্যি রে, তামাসা নয়, তাও নতুন চাইছি না, পুরোনো-টুরোনো একটা…

মালভা বললে—কেন, রোজগার করিস তো। রোজগারের পয়সা দিয়ে কিনগে না একটা পাঁৎলুন।

—পয়সা খরচ করে পাঁৎলুন কিনবো আমি! বলে, সে-পয়সায় মদ কিনে আরামসে খেতে পারি। হুঁঃ।

হাসতে হাসতে ইয়াকভ বললে—তাই যাও, পয়সা তো পেলে, মদ কিনে পেট ভরাও গে।

—কেন মদ খাবো না বাবা? জানো, গির্জ্জের আচার্য্যি ঠাকুর বলতেন,—মানুষ সব আগে যত্ন নেবে নিজের আত্মার! আত্মা যা চায়, তাই দিয়ে তাকে খুশী রাখবে…দেহখানার চিন্তাও করবে না। বুঝলে, আত্মা…আত্মা গো! তা আমার আত্মা চায় ভডকা…পিপে-পিপে ভডকা…তাতেই আমার আত্মার তৃপ্তি। পাঁৎলুনে আমার আত্মার এতটুকু তৃপ্তি হবে না। পয়সা পেয়েছি, ব্যস, চললুম এখন ভাঁটিতে। তবু তোমার বাবাকে আমি এ ব্যাপার জানাবো। মনে করো না, ঘুষ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করবে…তেমন পাত্র আমাকে পাওনি, ছোকরা।

—বলো, বলো আমার বাবাকে। হাত নেড়ে ইয়াকভ তুললো ঝঙ্কার।

তারপর মালভার কাঁধে হাত রেখে মালভার গায়ে গা মিলিয়ে বীরের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো ইয়াকভ।

সেরিওজকা দেখলো—দেখে থু-থু করে ইয়াকভের উদ্দেশে থুথু ফেললো। ফেলে সেরিওজকা বললে,—আর তোমার এ বেয়াদবির সাজাও আমি দেবো তোমায়। এ্যায়সা জোরে টানবো দুটো কাণ যে কাণ দুটো পা পর্য্যন্ত ঝুলে পড়বে। বেয়াদব বাঁদর ছোকরা!

—কিন্তু কেন আমার কাণ টানবে শুনি? কী তোমার আমি করেছি?

—কি করেছো? যা করেছো, আমি তা জানি। কিন্তু যাক্,…হ্যাঁ, শোন্ মালভা, আমাকে কবে তুই বিয়ে করছিস্ বল্!

—তার আগে তুই বল্, বিয়ে হলে আমায় নিয়ে গিয়ে তুই কোথায় রাখবি…আমাকে কি খেতে দিবি…কি পরতে দিবি? সে সব জানলে তারপর আমি বিবেচনা করে দেখবো।

সেরিওজকা তাকালো অপার অসীম সাগরের পানে। বললে,—থাকা আর খাওয়া-পরার চিন্তা করিস তুই! এ্যাঁ! আরে, কাজ-কর্ম্ম তোকে কিছুই করতে হবে না, তোকে তোয়াজে রাখবো। মজায় থাকবো দুজনে…খালি আয়েস।

—আয়েস করতে হলে হাতে টাকা-পয়সা চাই। সে টাকা-পয়সা তুই পাবি কোথায়?

—টাকা-পয়সা! আরে ছোঃ, টাকা-পয়সা আপ্‌সে আসবে ডানা মেলে! কিন্তু ও-সব বাজে কথা নয়, সব-তাতে তোর জ্যাঠামি! আর তর্ক তোলা চাই ··যেন আমার বুড়ো ঠাকুমা রে! কোথায়...কেন…কি সাত-সতেরো রকমের জিজ্ঞেস-পড়া। আমি মোদ্দা আর সবুর করবো না,

আজই আমার জবাব চাই···জবাব দিতে হবে। বুঝলি? এখন যাচ্ছি, গলাটাকে ভিজুতে হবে—অনেকক্ষণ বকবক করেছি!

টলতে টলতে সেরিওজকা চলে গেল। মালভা তার পানে চেয়ে আছে···মুখে হাসির রেখা! ইয়াকভও চেয়ে আছে সেরিওজকার দিকে ···তার দুচোখে বিরক্তি আর আক্রোশ।

সেরিওজকা অনেক-দূরে চলে গেলে ইয়াকভ বললে—ব্যাটা একের নম্বর শয়তান। নয়? আমাদের গাঁ হলে বাছাধনকে এখনি টিট্ করে দিতুম। তাছাড়া গাঁ হলে এতখানি বাড়তে পারতো? হুঁ, গাঁয়ের লোক মিলে ওকে ধরে এ্যায়সা গোবড়েন দিত যে চিঁ-চিঁ করতে হতো। এখানে সকলে ওর ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে, তবু ধরে দু-ঘা কষিয়ে দেবে না!

মালভা চাইলো ইয়াকভের পানে···দুচোখে রাজ্যের ঘৃণা ভরে'। মালভা বললে,—সাধে তোমাকে কালো কুকুরের বাচ্ছা বলেছি! মুখেই খালি ঘেউ-ঘেউ···কাজের বেলা···সুড়সুড় করে দিলে তো বেশ রোজ-গারের কড়ি ওর হাতে তুলে। তাছাড়া ওর কদর বুঝবে তুমি, সে হিকমত আছে তোমার?

—কদর! কি যে তুমি বলো! পাঁচটা কোপেক ফেলে দিলে যাকে পায়ের গোলাম করতে পারি···

বাধা দিয়ে দারুণ ঘৃণা-ভরে মালভা বলে উঠলো,—থামো, থামো, আর গজগজ করো না। কদর? ওর যা দাম, তার সিকির সিকি দাম যদি তোমার থাকতো, তাহলেও বুঝতুম। কোথায় ও নেই? যখন যা খুশী করছে, যেখানে খুশী যাচ্ছে! রুখুক দেখি, কে ওকে রোখে! কারো পরোয়া করে না!

ইয়াকভ ফোঁশ করে উঠলো—আমিই কি কারো পরোয়া করি?

মালভা এ কথায় কাণ দিলে না, কোনো জবাবও দিলে না। উদাস নেত্রে চেয়ে রইলো সাগরের দিকে। ঢেউয়ের গায়ে মিশে ঢেউ ছুটে আসছে তীরের দিকে···এসে নৌকোগুলোর গায়ে আছড়ে পড়ে তাদের ঠেলছে···সে-ঠেলায় নৌকোগুলো দুলছে দোলনার মত···একবার উঠছে উপর দিকে, আবার নামে নীচেয়। নৌকোয় খাটানো পালখানা হেলে একবার এদিকে কাৎ হচ্ছে, আবার তখনি ওদিকে···গলুইটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠছে আর নামছে। এ ওঠা-নামায় জলে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ হচ্ছে অবিরাম।

অনেকক্ষণ পরে মালভা ফিরে তাকালো ইয়াকভের দিকে, বললে,

—এইখানেই পেরেক এঁটে রইলে যে! যাবে না?

—কোথায় যাবো?

—কেন, এই যে বলছিলে, সহরে·· সেখানে খুব জরুরি কাজ।

—না, যাবো না।

—সহরে না যাও, বাপের আস্তানা?

—তাও যদি না যাই, তোমার কি?

—আমার কিছু নয়। তোমার থাকায়-যাওয়ায় আমার কি এসে যায়?

—তুমি সেখানে যাবে নাকি?

—না।

—তাহলে আমিও যাবো না।

—তাবলে আমার পিছনে লেগে থাকবে সারাদিন জোঁকের মতন?

—হ্যাঁ, থাকবো। আমার যদি ভালো লাগে এখানে থাকতে? তোমার জন্য ভালো লাগা নয়, এ জায়গাটা আমার ভালো লাগে, জেনে রাখো! এ-কথা বলে নৌকো থেকে লাফিয়ে সে জলে পড়লো।

মুখে এ-কথা বললেও ইয়াকভের মন কিন্তু হায়-হায় করে উঠলো। মালভাকে ছেড়ে তার কাছ থেকে দূরে-দূরে ইয়াকভের দিন কাটবে কি করে? চারিদিকে ভয়ানক শূন্যতা। দুটো কথা কইবে, এমন-জন কেউ নেই! তাছাড়া এই ভুবন-মোহিনী মালভার সঙ্গে এতক্ষণ মাতন করে, কথা কাটাকাটি করে' একসঙ্গে থেকে যে-আনন্দে মন ভরে উঠেছে, তেমন আনন্দের কণাও জীবনে কোনোদিন পায়নি! কিন্তু বাপ··মালভা আর ইয়াকভের মাঝখানে যেন মস্ত পাহাড়ের আড়াল! বাপের উপর রাগ হলো, ঘৃণায় মন ভরে উঠলো। তার মনে এ-ঘৃণা, এ রাগ কালও ছিল না...আজ ভোরে যখন স্নান করতে আসে, তখনো বাপের উপর এতটুকু ঘৃণা বা বিরাগ ছিল না! কিন্তু এখন···

মালভার ঐ অঙ্গের স্পর্শ···তার চোখে ঐ বিলোল দৃষ্টি···তার ঐ অধরের সুধা ··মালভার হাবে-ভাবে সব-কিছুতেই কী নেশা! এ-নেশা ইয়াকভকে নতুন মানুষ করে তুলেছে! দুনিয়াকে রঙীন করে ধরেছে তার সামনে!···

দুনিয়ার সবচেয়ে কমনীয় সামগ্রীর সন্ধান পেয়েছে আজ ইয়াকভ! মালভার মধ্যেই দুনিয়ার যা-কিছু সুখ, যা-কিছু আনন্দ, যা-কিছু আরাম! মালভাকে পেলে দুনিয়ার আর-কোনো কিছু সে চায় না!

মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বাপ···বাপ তার এ-কামনা-তৃপ্তির মস্ত বাধা! জঞ্জাল যেন! মালভা এতটুকু রাগ করেনি···ইয়াকভ তাকে নিয়ে কি না করেছে! বুকে টেনে জাপটে ধরেছে···চুমোয় চুমোয় বিপর্যস্ত করেছে···মালভাকে কত···কত···কত নিবিড় করে পাবার জন্য!

মালভার দিক থেকে এতটুকু প্রতিবাদ, এতটুকু আপত্তি ওঠেনি! মালভা নিশ্চয়···

কিন্তু মালভার ভয়, ভাসিলি পাছে টের পায়! এ ভয় যদি মালভার

না থাকতো, দুজনের মিলন তাহলে হতো অবাধ অটুট পরিপূর্ণ!

ফিশারীর লোকজনের ভিড়ে মিশে ইয়াকভ ঘুরে বেড়ালো। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা সেরিওজকার সঙ্গে। একখানা চালা-ঘরের ছায়ায় পিপের উপর বসে আছে···পায়ের কাছে একটা ভডকার বোতল পড়ে।

নানা ভঙ্গী করে' আপন-মনে সেরিওজকা গান গাইছে—

ও আমার পাহারওলা প্রাণ—
নিদয় হয়ে কেন যাদু
করে আছো মান?
খেয়ে মদ টলোমলো
থানাতে নিয়ে চলো
শুতে একটু জায়গা দিয়ে বাঁচাও আমার জান।

সেরিওজকাকে ঘিরে একগাদা লোক·· হৈ-হৈ করছে। তাদের বেশও সেরিওজকার মতো···ছেঁড়া, তালি-দেওয়া, কদর্য্য নোংরা। ভিড়ে চারজন স্ত্রীলোক আছে! বিশ্রী চেহারা। মেয়েরা বসে আছে বালির উপর···সামনে বড় উনুনে প্রকাণ্ড একটা কেটলি চাপানো। সেই কেটলি থেকে চা ঢেলে ঢেলে সকলে খাচ্ছে। একজন জেলে···নেশায় একেবারে বুঁদ্। বেলা এখনও নটা বাজেনি, নেশায় সে এমন ত্বর যে বসবার সামর্থ্য নেই তার, বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করছে, পারছে না উঠতে। ভিড়ে কে একজন ভাঙ্গা একটা আকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে···যেমন বেসুরো, তেমনি বেতালা। মাছের আঁশের গন্ধে বাতাস বীভৎস।

একদিকে একগাদা খালি পিপে জড়ো করা আছে—তার দৌলতে

খানিকটা ছায়া হয়েছে। ইয়াকভ এসে সেই ছায়ায় দেহ লুটিয়ে দিলে···অত্যন্ত শ্রান্ত... কাছে এমন হৈ-হৈ রব, তবু লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ঘুম।

সে ঘুম ভাঙ্গলো সন্ধ্যার একটু আগে। জেগে উঠে ফিশারীর চারিদিকে পায়চারি করে বেড়ালো। মন উদাস শূন্য···শুধু মনে হচ্ছে, কাকে যেন চাই...কে যেন ডাকছে!···কিন্তু কোথায়? কোথায়?

প্রায় দুঘণ্টা ধরে এমনি লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন ঘোরার পর ইয়াকভ এলো কতকগুলো গাছের ছায়ায় ছায়া-করা এক জায়গায়। এসে দেখে, ছায়াতে মালভা কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতে মলাট-ছেঁড়া একখানা বই।

ইয়াকভকে দেখলো মালভা; দেখে হাসলো···মৃদু হাসি।

ইয়াকভ বসলো মালভার পাশে···বললে,—তুমি এখানে শুয়ে আছো!

স্নিগ্ধকণ্ঠে মালভা বললে—আমায় তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছো নাকি?

—ইস্, খুঁজিনি তো! কেন খুঁজবো? ···ইয়াকভ দিলে জবাব··· তারপর চাইলো মালভার পানে। মনে হলো, কোনো কিছুতে মন অবলম্বন পাচ্ছে না, নির্ভর পাচ্ছে না...অথচ অস্থিরতার সীমা নেই! মন কি যেন চাইছে—এত ঘুরেও মনকে শান্ত করতে পারছে না! মন যেন মালভার সান্নিধ্য চেয়ে চেয়ে··· মালভা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ইয়াকভের পানে। ইয়াকভ হাসলো।

মালভা বললে—তুমি পড়তে পারো?

—পারি। তবে তেমন ভালো নয়। কবে একটু আধটু শিখেছিলুম। এ্যাদ্দিনে···চর্চ্চা তো নেই...হয়তো কিছু-কিছু ভুলে গেছি। তুমি পড়তে পারো?

—ভালো পারি না। তুমি ইস্কুলে পড়েছিলে?

—হুঁ। গাঁয়ে ছোটখাট একটা ইস্কুল আছে ···সেই ইস্কুলে।

মালভা বললে—ইস্কুলে আমি পড়িনি কখনো। নিজে নিজে একটু আধটু পড়তে শিখেছি।

—নিজে নিজে? ইয়াকভের আশ্চর্য্য লাগলো।

—হুঁ। আস্ত্রাকানে এক উকিলের বাড়ীতে রান্নার কাজ করতুম। সেই উকিলের ছেলে আমাকে পড়তে শিখিয়েছিল।

—তাই বলো···নিজে তাহলে শেখোনি!

ইয়াকভের পানে কুতূহলী দৃষ্টি···মালভা জিজ্ঞেস করলে,—বই পড়তে চাও তুমি?

—আমি! না, বই পড়ে কি করবো শুনি?

—আমি কিন্তু পড়তে ভালোবাসি।···এই দ্যাখো···

বলে হাতের বইখানা মালভা দেখালো, বললে,—ফিশারীর এজেণ্ট আছে না? তার বৌ···এ সেই বৌয়ের বই। আমি চেয়ে এনেছি পড়বো বলে। শুয়ে শুয়ে এইটেই পড়ছিলুম।

—বইয়ে কি কথা আছে?

—আলেক্সি বলে একজন সাধু লোক ছিল, তার কথা আছে এ বইয়ে।

কণ্ঠে আবেশ মিশিয়ে মালভা বলতে লাগলো বইয়ের গল্প: খুব ধনী আর মানী লোকের ছেলে···জোয়ান বয়স···সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, বাপ-মা, বাড়ী-ঘর···সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর অনেক বছর পরে ফিরে এলো ছেঁড়া কানি-পরা গরীব ভিখিরী রোগা ডিগডিগে চেহারা! হাড় জিরজির করছে। এসে বাপের উঠোনে বাপের কতকগুলো

পোষা কুকুর থাকতো, তাদের সঙ্গে পড়ে রইলো! কেউ চিনতে পারেনি তাকে। এমনি পড়ে থাকতে থাকতে সে মরে গেল—মরে যেতে তখন বাড়ীশুদ্ধ সকলে জানতে পারলো, ভিখিরী হলো এ-বাড়ীর সেই ঘর-ছাড়া ছেলে·· সকলের আদরের দুলাল ছিল একদিন!

গল্প শেষ করলো মালভা করুণ সজল কণ্ঠে। শেষ করে' ইয়াকভকে বললে,—কেন সে অত ঐশ্বর্য্য বিলাস স্নেহ ভালোবাসা আদর···সব ছেড়ে চলে গিয়েছিল, বলতে পারো?

এত-বড় কঠিন হেঁয়ালি ইয়াকভ জন্মে শোনেনি! সে বললে,—না, আমি কি করে বলবো? যাকে চিনিনা জানিনা···ইয়াকভের মন নির্লিপ্ত নির্বিকার।

বাতাসে বালি উড়ে উড়ে এসে পড়ছে দু জনের গায়ে। অদূরে সাগরের বুকে ঢেউয়ের কলগান। দূর থেকে অদ্ভুত একটা মিশ্র কলরব ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে ছুটীর দিনে ফিশারীর প্রমোদ-পিয়াসীদের উল্লাসের হো-হো অট্টরব। পশ্চিম-আকাশ লালে লাল। দিগন্ত-প্রসারিত বালির উপর অস্ত-সূর্য্যের কিরণ পড়েছে, সারা তীরভূমি সে-কিরণে রাঙা হয়ে উঠেছে। বাতাসে উইলো গাছগুলোর পাতা কাঁপছে! সে কাঁপনে উঠছে অপরূপ মর্ম্মর শব্দ। মালভা নির্ব্বাক নিথর। মনের মধ্যে শুধু একটা প্রশ্ন ঘুরছে চাকার মতো,···কেন···কেন অত সুখ, অত আরাম অমন ঐশ্বর্য্য···সব ছেড়ে ধনীর দুলাল ছেলে জোয়ান বয়সে বিবাগী হয়ে চলে গিয়েছিল?

হঠাৎ ইয়াকভ প্রশ্ন তুললো,—বাবার ওখানে যাওনি আজ?

মালভার স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা যেন চূর্ণ হয়ে গেল!

বিরক্তিভরা কণ্ঠে মালভা বললে,—তার জন্য তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

মালভাকে নির্জ্জনে কাছে পেয়ে ইয়াকভের বুকে আবার প্রচণ্ড ক্ষুধা জেগে উঠেছে—জীবন্ত রক্ত-মাংসের ক্ষুধা! মনে কামনার আগুন জ্বলছে! কি করে' মনের এ কামনা প্রকাশ করে' জানাবে, ভেবে সে আকুল।

মালভা বললে.—করুণ মৃদু-কণ্ঠ...বললে,—আমি যখন একা থাকি···কোথাও কোনো গোলমাল নেই...শব্দ নেই···কেউ নেই···তখন আমার ভয়ানক কাঁদতে ইচ্ছা করে। হয় তখন খুব কাঁদি, না হয় গান গাই! দুঃখ এই এমন একটা ভালো গান জানিনা, যে-গান গেয়ে মনে একটু আরাম পাবো! কেঁদেই কি আরাম পাই? তাছাড়া এ-বয়সে কাঁদতেও লজ্জা করে!

স্বর শুনে ইয়াকভ আশ্চর্য্য হয়ে মালভার পানে তাকালো। এ যেন আর এক মালভার কণ্ঠ! মালভার যে-কণ্ঠ শুনেছে, সে-কণ্ঠ···উদ্দাম, চটুল! যে কণ্ঠ বিহ্বল করে, বিভোর করে···এ সে-কণ্ঠ নয়! তার উপর গোধূলি বেলা···কোথায় মালভার সেই মন-মাতানো, চোখ-জুড়ানো,—বিভোর-বিহ্বল-করা রূপ? এ রূপ যেন···ঠিক···ইয়াকভ দেখেছে, পাথরের গায়ে খোদা ধ্যানী তপস্বিনীর মূর্ত্তি! মালভার এ-মূর্ত্তি যেন সেই তপস্বিনীর মূর্ত্তি!···এ-মূর্ত্তিকে স্পর্শ করতে ভয় হয়!···

তবু···প্রাণ আকুল, অধীর হলো···বাসনার শিখা হলো আরো তীব্র প্রখর! মন বলতে লাগলো, এমন নিরালা জনহীন স্থান···এমন সুযোগ জীবনে আর মিলবে না হয়তো! মনের ভাব স্পষ্ট না জানাতে পারলেও ছোট একটু ইঙ্গিতে যদি···

ইয়াকভ বললে—শোনো মালভা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে …বিশেষ কথা।

মালভার গা ঘেঁষে সে বসলো; মালভার মুখে একাগ্র দৃষ্টি মেলে বললে—শোনো, যা বলি...তোমার এই জোয়ান বয়স…

বাধা দিয়ে মালভা বললে—আর বুদ্ধি নিরেট?

ইয়াকভ বললে,—তা নয়। আমিই বোকা নিরেট। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে বুদ্ধিমান হবার কোনো দরকার দেখি না।…হ্যাঁ, আমি মানছি আমি বোকা, তবু আমি যা বলতে চাই…মানে, শোনো, তোমার মত আছে?

ঝঙ্কার দিয়ে মালভা বলে' উঠলো,—না, না, না আমার মত নেই।

—কিসের মত? বাঃ,…আমার কথাটা আগে শোনো…

মাথা নেড়ে মালভা বললে,—তোমার কোনো কিছুতেই আমার মত নেই…তোমার সব কথাতেই আমার আপত্তি আছে…ভয়ানক আপত্তি! বুঝলে!

ইয়াকভের আর ধৈর্য্য থাকে না! মালভার কাঁধে হাত রেখে… কণ্ঠে অনেকখানি আবেশ মিশিয়ে ইয়াকভ বললে,—দুষ্টুমি করো না মালভা…পাগলামির কথা নয়…মনের খাঁটি কথা বলছি আমি—যে-দিব্যি গালতে বলো, সেই দিব্যি গেলে বলতে পারি, আমার কথা যদি শোনো…আর শুনে যদি বোঝো…

ইয়াকভের হাতখানা ঘৃণাভরে সবলে ঠেলে দিয়ে মালভা উঠে বসলো। তার কণ্ঠে আগুনের ঝাঁজ! মালভা বললে, —চলে যাও, চলে যাও বলছি ইয়াকভ সত্যি…আমার ভালো লাগেনা তোমার এ বাঁদরামি! সরে যাও আমার কাছ থেকে।

ইয়াকভ উঠে দাঁড়ালো হতভম্বের মতো তার পর বললে,—বেশ, চলেই আমি যাচ্ছি তোমার কাছে আর কখনো ঘেঁষবো না। কিন্তু জেনো তোমার মতো মেয়েমানুষ এখানে বহুৎ আছে...মাখনের মতো নরম···ফুলের মত তাজা! তুমি ভাবো, তুমি তাদের টেক্কা দেছো···হুঁঃ!

স্কার্টের বালি ঝেড়ে মালভা বললে,—মাথা ঠাণ্ডা করে' এখন ভাগো তো তুমি।

দুজনে চলেছে পাশাপাশি···ফিশারীর দিকে চলেছে। ধীর মন্থর গতি··· বালিতে পা বসে যাচ্ছে।

যেতে যেতে ইয়াকভ স্পষ্ট ভাষায় জানালো তার ক্ষুধিত বাসনার কথা। মালভা নীরব···কোনো জবাব দিলে না। ইয়াকভের অনুরোধ মিনতির অন্ত নেই। মালভা হো-হো করে' শুধু হাসে, কাটা-কাটা শ্লেষে তাকে বেঁধে।

চালা-ঘরগুলোর পাশে হঠাৎ ইয়াকভ থমকে দাঁড়ালো। তার পর জানোয়ার যেমন করে' শীকার ধরে, তেমনি আচম্‌কা সে মালভার কাঁধখানা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে বললে—কেন আর মিছে আমার জ্বালাতন করো? তুমিই আমাকে মাতিয়ে তুলেছো···নিজেকে আমার সামনে পশরার মতো কি ভাবে না মেলে ধরেছো! কেন আর খেলাও? আমার কথায় রাজী না হও, যে-হাল তোমার করবো, তাতে তোমার আপশোষের সীমা থাকবে না।

শান্তভাবে নিজেকে ইয়াকভের কবল থেকে মুক্ত করে' সহজ মৃদু কণ্ঠে মালভা বললে,—এখন তুমি যাও তো। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। দোহাই বলছি, আমাকে বিরক্ত করো না।

কথাটা বলে' মালভা একটু সরে' গেল ইয়াকভের কাছ থেকে!

চালা-ঘরগুলোর ওদিক থেকে আসছিল সেরিওজকা। তুজনকে একান্তে দেখে হন্ হন্ করে' সে এগিয়ে এলো। তার মুখে শ্লেষের হাসি। মাথা নেড়ে বললে,—তুজনের বেড়ানো হলো ?

ঝেঁজে মালভা বললে,—সগোষ্ঠী তোমরা নিপাত যাও।

ইয়াকভ দাঁড়ালো সেরিওজকার সামনে। সেরিওজকার পানে তাকালো···তোর চোখে বেকুবের দৃষ্টি। তুজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র দশ-পা। সেরিওজকা তাকালো ইয়াকভের পানে···বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তুমিনিট তুজনে সাম্‌না-সাম্‌নি...তাব পর নিঃশব্দে সেরিওজকা হঠাৎ গেল চলে।

ইয়াকভ চললো তার উল্টো দিকে।

সাগরের বুক শান্ত···তরঙ্গের উপদ্রব নেই। অস্ত-সূর্য্যের কিরণ তখনো ছড়িয়ে আছে সাগরের বুকে। ফিশারীর লোকজনের মিশ্র কলরব···সে-কলরব ভেদ করে' বাতাস চিরে ভেসে আসছে এক মাতাল স্ত্রীলোকের কর্কশ কণ্ঠের গান।

ভোরের আলো ফুটেছে বেশ। সে আলোয় সাগরের ঘুম এখনো ভাঙ্গেনি। সাগর যেন ঢুলছে···বুকে তার মেঘের কালো কালো ছায়া।

ফিশারীর অফিসের কাছে সদ্য-ঘুমভাঙ্গা কজন জেলে মাছ ধরবার নৌকোয় জাল তুলে বেরুবার উদ্যোগ করছে। বালির বুক থেকে নৌকো পর্য্যন্ত কখানা জাল তখনো ভাঁজ করা হচ্ছে নৌকোয় তোলবার জন্য।

মাথা খোলা···টুপি নেই···সেরিওজকা নিত্যকার মতো অৰ্দ্ধনগ্ন দেহে একখানা নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় জেলেদের তাড়া দিচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্য। মদের নেশায় তার কণ্ঠ এখনো জড়ানো।

বাতাসে তার ব্লাউশের হাতা দুটো ফুলে ফেঁপে উঠেছে—মাথার লম্বা চুলগুলো কস্মিন কালে আঁচড়ায় না, সেগুলো উড়ছে খাড়া হয়ে লম্বা লম্বা ঘাসের শিষের মতো।

চেঁচিয়ে কে একজন বলে' উঠলো—সবুজ দাঁড়গুলো গেল কোথায় ভাসিলি ?

ভাসিলির ভ্রূযুগ কুঞ্চিত...ভাঁজ-করা জালগুলো জড়ো করে নৌকোয় সে গুছিয়ে রাখছে।

সেরিওজকার ঠোঁট শুকিয়ে উঠেছে...জিভ দিয়ে ঠোঁটে লালা নিচ্ছে। এগিয়ে এসে ভাসিলিকে জিজ্ঞাসা করলে সেরিওজকা—তোমার কাছে ভডকা আছে ?

ভাসিলি বললে,—আছে।

—তাহলে আর বাইরে যায় কে ? এইখানেই গাড্ডিল হয়ে বসলুম।

ওদিক থেকে কে বলে উঠলো—সব তৈরী।

শুনে আদেশের ভঙ্গীতে সেরিওজকা বললে,—নৌকো ছাড়ো সকলে...আকাশ খাশা পরিষ্কার।

এ কথা বলে' সামনের নৌকোখানাকে সেরিওজকা দিলে জলে ঠেলে—দিয়েই সে নৌকোর মাঝিকে বললে,—তুমি যাও···বসো গে···আমি হাল ধরবো। তুমি জাল ফেলো। মোদ্দা হুঁশিয়ার, জড়িয়ে ফেলো না। ঠিক পাটে পাটে ভাঁজ করে নাও—জোট পড়েনা যেন!

নৌকো জলে ভাসলো—মাঝিরা চটপট উঠে পড়লো···উঠে দাঁড় ধরলো···সঙ্গে সঙ্গে টানা সুরু।

ডাঙ্গা থেকে সাড়া জাগলো,—এক···

জলে দাঁড় পড়লো—প্রথম টান্। সে-টানে নৌকো দরিয়ায় ভাসলো।

আবার সাড়া,—দুই—

দাঁড় উঠলো...দু-দিককার দাঁড়...কচ্ছপের পায়ের মতো! ডাঙ্গায় পাঁচজন···সেরিওজকা, ভাসিলি ..তাদের সঙ্গে আর তিনজন··· ক'জন লাফ দিয়ে এর মধ্যে ডাঙ্গায় নেমেছিল...

একজন বললে—আর একটু গড়িয়ে নি ততক্ষণ!

বাকী দুজনও সেই পন্থা অনুসরণ করলে···ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু সেরিওজকা আর ভাসিলি।

ভাসিলি জিজ্ঞাসা করলে সেরিওজকাকে—রোববারে এলে না যে বড়?

—আসতে পারলুম না।

—কেন? মদ গিলে বেহুঁশ ছিলে?

—না, না—তোমার ছেলের উপর আর ছেলের সৎমার উপর নজর রাখছিলুম।

মুখে শুষ্ক হাসি···ভাসিলি বললে,—খুব ভালো কাজ পেয়েছিলে, বলো! কিন্তু ওরা তো খোকা-খুকী নয় যে ওদের উপর নজর রাখবে!

—তার চেয়েও বেহাল ওরা। একজন বেজায় আহাম্মক···আর একজন পরম ধার্ম্মিক।

—ধার্ম্মিকটা কে? মালভা? ভাসিলি করলো প্রশ্ন...তার দু চোখে রাগের দীপ্ত শিখা।

সেরিওজকা বললে—কি জানো, মালভার মনটা ওর ও-শরীরে খাপ খায় না কেমন। ওর শরীরখানা যেন ওর নয়, আর একজনের—মনখানা ওর নিজের!

—হুঁ। অমন শয়তানের মন আর আছে না কি কারো?

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে সেরিওজকা তাকালো ভাসিলির পানে···তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে—শয়তানের মন? ধেৎ···কি যে বলো! তুমি একদম্, যাকে বলে, কাণা! শুধু কাণা নও, আহাম্মকের ধাড়ি, কিস্যু বোঝোনা! তুমি চাও ভাসিলি, মেয়েমানুষের গোলগাল নরমনধর দেহখানা! তার মন···মানে, যেটা তার আসল জিনিষ···সে-মনের কোনো খবর রাখো না! মেয়েমানুষের সার পদার্থ হলো তার মন—তার স্বভাবটুকু! দেহখানা তো ফাঁকি! যে মেয়েমানুষের মন বলে কোনো পদার্থ নেই, স্বভাবের বালাই নেই, তাকে পাওয়া আর আলুনি-ব্যঞ্জন খাওয়া সমান। এ দুয়ে কোনো তফাৎ নেই। যে বেহালার তার ছেঁড়া, সে বেহালা বাজে না, বাজানো যায় না। যে বেহালার তার বাঁধা নেই, তাতে কি সুর মেলে? হুঁ।

ভাসিলি তাচ্ছল্যের ভরে বললে—বেদম্ মদ খেলে তুমি মোদ্দা খাশা বক্তৃতা দিতে পারো সেরিওজকা?

ভাসিলির মন হয়েছে চঞ্চল, অধীর! সেরিওজকাকে জিজ্ঞাসা করতে চায় ···ইয়াকভ আর মালভাকে সে কোথায় দেখেছে এক সঙ্গে ···দুজনে কি করছিল...সব জানতে চায় এখনি। কিন্তু লজ্জা হচ্ছে··· এ প্রশ্ন করতে পারলো না।

দুজনে এলো চালা-ঘরে। ঘরে ঢুকে একটা বোতল থেকে ভডকা ঢেলে ভাসিলি দিলে সেরিওজকার হাতে। ভাবলো, নেশা পাক্‌লে নেশার ঘোরে সেরিওজকার দিল যাবে. খুলে তখন আপনা থেকেই গড়গড় করে' মুখস্থ বলে যাবে'খন···ওদের বৃত্তান্ত!

গ্লাসটা নিঃশেষ করেও কিন্তু সেরিওজকা বেহুঁশ হলো না। শুধু হাই তুলে পাতা চ্যাটাইয়ের উপর সে আড় হয়ে শুয়ে পড়লো। বললে,—এক-চুমুকে একটি গ্লাস সাবাড়...পেটে যেন

খানিকটা আগুন গুঁজে দিলুম!

ভাসিলি বললে,—তবু আগেকার মতো আর গিলতে পারো না তুমি।

সেরিওজকা বললে,—আলবৎ পারি।···তারপর হাতের একটা দিক দিয়ে গোঁফ মুছে আবার বলতে লাগলো—পারি গো দাদা, ঠিক তেমনি পারি এখনো। যা আমি করি, সব বাড়াবাড়ি। তবু খাচ্ছি তো খাচ্ছিই—এমন ধাত আমার কস্মিন কালে নয়।···আমার মন্ত্র হলো, যা করবে চট্‌পট্ সেরে নাও।··· কূর্ম্মনীতির উপর আমি হাড়ে চটা। গয়ংগচ্ছ করতে নেই···কোনো কিছুতে না। জানি, সবার ঐ এক পথ। কচ্ছপ বলো আর খরগোস বলো, সকলের ঐ এক গতি দাদা! ধূলোয় উদয় হয়ে ধূলোয় বিলয়! এ বিধান পারো তুমি উল্‌টোতে?

অন্য কথা পেড়ে ঘুরিয়ে যদি ওদের খবর আদায় হয়···এই ভেবে ভাসিলি কথার মোড় ফেরালো, বললে,—ভালো কথা, তুমি যে ককেশসে যাবে বলেছিলে·· তার কি হলো?

—যাবো! মর্জ্জি হলেই চলে যাবো···মর্জ্জি হলে কারো তোয়াক্কা রাখবো, ভাবো? হুঁঃ!·· এক দুই তিন সেরিওজকা চলো ককেশস্। ব্যস্! জানো মাথার টনক যদি নড়ে, তাহলে কার সাধ্য, রোধে গতি! না হলে চমকে উঠি, ভাসিলি...সত্যি, ক্ষেপে উঠি। এ স্বভাব আমার আর কোনো কালে গেল না!

ভাসিলি বললে,—তার মানে, তোমার ঘটে বুদ্ধি আর গজালো না কোনো দিন!

—বটে! তুমি ভাবো তুমিই শুধু চালাক···না? বলি, থানায় ক'বার কত-ঘা কোড়া খেয়েছো তুমি ,শুনি?

ভাসিলি শুধু সেরিওজকার পানে তাকিয়ে রইলো—কোনো জবাব দিলে না।

সেরিওজকা বললে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে—থানার কোড়া জোগাবে বুদ্ধি? সেটা বুঝি অহঙ্কার করবার জিনিষ? হুঁঃ—মগজ নিয়ে লাভ? মগজ বাজালে কী এমন চতুর্বর্গ ফল লাভ করবো, বলো তো? কথাটা বোঝো! আমি যা করি, মগজ খাটিয়ে কখনো তা করি না। সিধে যা মনে জাগে, তাই আমি করে আসছি চিরকাল। তার জন্য কখনো পোস্তেছি? আর আমি বাজি রাখতে পারি, ভাসিলি—তোমার চেয়ে ঢের বেশী মজাতেই আমি দিন কাটিয়া যাবো। হুঁ…

হাসতে হাসতে ভাসিলি বললে—হ্যাঁ, তা তুমি যাবে…সাইবেরিয়া পর্যান্ত যাবে! আমি মোদ্দা অতখানি যেতে পারবো না!

সেরিওজকা হো-হো করে হাসতে লাগলো।

ভাসিলির বাসনা পূর্ণ হলো না। ভডকা খাওয়ানো মিথ্যা হলো। রাগ হলো সেরিওজকার উপর। হাসি-মুখে আরো এক পাত্র সে দিতে পারতো সেরিওজকাকে…কিন্তু বাজে খরচ করে লাভ?

যখন নেশা হয়নি তখন যেমন, এখন নেশা করেও সেরিওজকা তেমনি হুঁশিয়ার। ভাসিলির মনে এমনি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করছে, সেরিওজকা নিজে থেকেই হঠাৎ কথাটা পাড়লো। বললে—হুঁ, ভালো কথা, মালভার কথা জিজ্ঞাসা করছিলে না আমাকে?

—না:! মালভার কথায় আমার কি এমন দরকার? ভাসিলি বললে সম্পূর্ণ নির্বিকারের ভঙ্গীতে। বুক কিন্তু কাঁপছে.. দুম্ করে' যদি সেরিওজকা এমন কিছু বলে বসে!

সেরিওজকা বললে—গেল-রোববারে তোমার কাছে সে আসেনি বোধ হয়? না, এসেছিল?

ভাসিলি কোনো জবাব দিলে না। বুকের মধ্যে মেঘ জমছিল!

সেরিওজকা বললে—এ ক'দিন সে কোথায় ছিল, কি করছিল,—জানো ?

ভাসিলি ইঙ্গিতে কোনো জবাব দিলে না।

—বুঝেছি দাদা, রিষের বিষে তোমার বুক জলছে...নয় ?

অবজ্ঞার সুরে ভাসিলি বললে,—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব ? মালভার মতো মেয়ে পথে-ঘাটে অঢেল মেলে !

—মেয়ে-মানুষকে তবে তুমি ছাই জানো ! হুঁঃ···মালভার মতো মেয়ে ! কিসে আর কিসে। বলে, মধু আর আলকাতরা ! এ দুয়ের স্বাদে কত তফাৎ, তুমি তার কি বুঝবে ? তুমি হলে চামড়া আর মাংসর কাঙাল।

শ্লেষ-ভরে ভাসিলি বললে,—মালভার সুখ্যাতি যে মুখে ধরে না তোমার ! হঠাৎ তাকে আজ স্বর্গে তোলার মানে ? ঘটকালি করতে এসেছো ? কিন্তু বড্ড দেরীতে এসেছো হে !

সেরিওজকা চেয়ে রইলো ভাসিলির পানে···অনেকক্ষণ . কোনো কথা না বলে'। তারপর ভাসিলির কাঁধে হাত রেখে একটা নিশ্বাস··· নিশ্বাস ফেলে বললে,—আমি জানি, তুমি তাকে রেখেছো···তোমার সঙ্গে আছে বলে' আমি ঘাঁটাইনা ! ঘাঁটাবার দরকারও মনে হয়নি। কিন্তু এখন···তোমার গুণধর ছেলে ঐ ইয়াকভ যেভাবে মালভার পিছনে ঘুরছে, যেন হ্যাঙলা কুকুর ! ওদের দু-হাত এক করে দাও···বুঝলে দাদা ! দিতে তোমার হাত যদি না ওঠে, আমি দেবো ওদের দু-হাত এক করে'। তুমি মানুষ খারাপ নও...শুধু বুদ্ধির যা অভাব ! তোমার আর মালভার মধ্যে আমি এসে কোনোদিন দাঁড়িয়েছি কি ? দাঁড়াইনি···এ কথাটা মনে রেখো।

ভাসিলির বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো। উদাস কণ্ঠে সে বললে,—বুঝেছি। মানে, মালভার উপর তোমারো বেজায় লোভ···তুমি এখন নিজের ভোগে ওকে চাও!

—আরে ছোঃ! সে-লোভ আমার থাকতো যদি, তাহলে কি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতুম? না, মাথা ঘামাতুম? ইচ্ছা মাত্র দখল নিতুম। তোমার সাধ্য ছিল বাধা দেবে?···তা নয়! আমি জানি, তার পাশে দাঁড়াবো, সে যোগ্যতা আমার নেই—মিছে কেন দুঃখ ডাকা! আমি মেয়ে-মানুষের দেহখানা শুধু চাইনা! আমি চাই দেহের সঙ্গে তার মনটাকেও - মানে, গোটা-মানুষটাকে আমি চাই।

ভাসিলির মনে সংশয়ের বাষ্প বেশ ঘনায়িত হয়ে উঠলো। কম্পিত কণ্ঠে ভাসিলি বললে,—এখন তাহলে মালভার জন্য তোমার মাথা ঘামানোর মানে?

কথাটা ভাসিলি শেষ করতে পারলে। না...যেটুকু বলেছে, তাতেই না-বলাটুকুর সব কিছু আভাস!

হাসতে হাসতে সেরিওজকা বললে,—কেন মাথা ঘামাচ্ছি? হুঁ:—ভগবান জানেন, কেন! মেয়েটা ভারী চমৎকার, সত্যি। আহা, কী চমৎকার ওর মন! ওকে আমি সত্যি ভালোবাসি—খু-উ-ব ভালো-বাসি। ওকে আম···মানে, ও যাতে সুখী হয়···চাই। আশ্চর্য্য মেয়ে বটে মালভা! ওর জোড়া আর-একটি মেয়ে তো কোথাও দেখলুম না! আমার এত বয়স হলো এই বয়সে! তাই হয়তো ওর জন্য এত আমার মমতা!

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেরিওজকার পানে চেয়ে চেয়ে ভাসিলি শুনলো তার কথা। মন বলছিল, না, সেরিওজকা ছলনা করছে না—ওর মনে কাপট্য নেই।

ভাসিলি বললে,—হুঁ। ও যদি···মানে, তোমরা যাকে বলো, অনাঘ্রাত কুসুম···মানে, মালভা যদি নিষ্কলঙ্ক কুমারী হতো, তাহলে তোমার এ মমতার মানে বুঝতুম···তা যখন ও নয়, তোমার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি!

সেরিওজকা জবাব দিলেনা···নিরুত্তরে চেয়ে রইলো বহু দূরে ঐ সাগরের বুকে একখানা মাছের নৌকো চক্র দিয়ে ডাঙ্গায় এসে ভিড়ছে, সেই নৌকোর দিকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত···কেমন এক দীপ্তিতে জ্বল্‌জ্বল্ করছে···মুখে মমতা মাখানো।

ভাসিলির মন একটু নরম হলো। সেরিওজকার পানে চেয়ে সে বললে—তুমি যা বললে, কথাটা ঠিক! মেয়েটা সত্যি চমৎকার। রীত-চরিত্তির যদি এতটা না আল্‌গা হতো! আর ইয়াকভ? জাহান্নমে যাক···কুত্তাকি বাচ্ছা!

সেরিওজকা বললে—তোমাকে স্পষ্ট বলছি, দাদা, তোমার ছেলেটা ব্যাদড়া। ওকে আমার একটুও ভালো লাগলো না।

দাঁতে দাঁত চেপে ভাসিলি বললে—তুমি যা বললে, মালভার পিছনে ঘুরছে প্রেম করবে বলে'···

জোর-গলায় সেরিওজকা বললে—তুমি আর মালভা..তোমাদের দুজনের মধ্যে শনিগ্রহ হয়ে দাঁড়াবেই। এ যদি না হয়, আমার কাণ দুটো কেটে তুমি জলে ফেলে দিয়ো!

উদয়-সূর্য্যের আলো আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে···ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে সাগরের বুকের একখানা নৌকো থেকে আওয়াজ এলো ভেসে—হয়েছে, হয়েছে ..জোর্‌সে টানো। সে আওয়াজ শুনে এখান থেকেই সেরিওজকা হাঁকলো—জাল গুটোও···গুটিয়ে নাও চট্‌পট্..

নৌকোর উপরে ভয়ানক চাঞ্চল্য। চার-পাঁচজন জেলে ছিল নৌকোয়। ডাঙ্গা থেকে লোহার তার গেছে সোজা সেই নৌকো পর্য্যন্ত...আরো কখানা জাল জুড়ে এক করে' সেই তারের জালে বাঁধা···ওদিককার মাছগুলো স্রোতে ভেসে জালে এসে লাগে—মাঝিরা তখন তার টেনে জাল গুটোয় সরাসরি...সঙ্গে সঙ্গে নৌকো আসতে থাকে ডাঙ্গার দিকে। এখানকার এই দস্তুর। এবং সে দস্তুর মেনে ও নৌকোখানা জাল গুটোতে গুটোতে ডাঙ্গার দিকে আসছে!

সূর্য্য আরো খানিক এগিয়ে এলো আকাশের গায়ে খরতর রশ্মি বিকীর্ণ করে'।

ভাসিলি বললে সেরিওজকাকে...অনুযোগের সুরে—ইয়াকভকে যদি দেখতে পাও, বলো, কাল যেন সে এসে নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করে।

—বলবো।

নৌকোখানা ডাঙ্গায় এসে লাগলো। জেলেরা লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় নামছে···নিজের নিজের জাল গুটিয়ে। জাল টানার দরুণ জালে বাঁধা সোলার টুকরোগুলো সাদা ফেনার মতো জলের বুকে ভাসছে

* * * *

* * *

* *

সন্ধ্যার একটু পরে...

জেলেরা রান্নাবান্না করছে..শ্রান্ত দেহে মালভা এসে উপুড়-করা ভাঙ্গা একখানা নৌকোর উপরে বসলো। সাগরের বুক আঁধারে ভরে' আসছে। নৌকোয় বসে মালভা দুচোখের দৃষ্টি ঐ অন্ধকারে প্রসারিত করে দিলে। দূরের চালাঘরে আলো জ্বলছে···ও আলোর সঙ্গে মালভার

কতদিনের কী নিবিড় পরিচয় ! ও আলো ভাসিলি জেলেছে ! চারি দিককার ঘনায়মান অন্ধকারে আলোটুকুকে তার মনে হচ্ছে দুঃখ-দুর্দ্দশার নিরন্ধ্র অন্ধকারে এতটুকু যেন কিরণ-রশ্মি ! আলোর ঐ রশ্মিটুকুর পানে চেয়ে থাকতে থাকতে মালভার মন বেদনার বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। ধূ-ধূ মরু-প্রান্তরে নিজেকে যেন আজ হারিয়ে ফেলেছে ! যেন অজস্র তরঙ্গমালার মধ্যে কোথাও সে থই পাচ্ছেনা··· একটু দাঁড়াবে, অবলম্বন পাবে, আরাম পাবে, বিরাম পাবে, এমন তার কিছু নেই !

হঠাৎ পিছনে সেরিওজকার কণ্ঠ...

সেরিওজকা বললে,—আরে, এখানে এমন ঘুপটি মেরে' বসে আছিস !

চোখে ভ্রূকুটি···মালভা বললে,—তোমার কি তাতে ?

—কিছু আছে বৈ কি আমার ! তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কথাটা বলে' সেরিওজকা ভালো করে' মালভাকে পর্য্যবেক্ষণ করে' নিলে···তারপর একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে উঠে বসলো সেই উল্‌টোনো নৌকোখানার পিঠে ! কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকবার পর কণ্ঠে দরদ ঢেলে বললে,—সত্যি, তুই কিন্তু ভারী মজার মানুষ মালভা ! সব সময়ে তুই লুকোচুরি খেলবি ! এই দেখি, সামনে রয়েছিস, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোথায় গেছিস্ উঠে। আবার তার পরের মিনিটে দেখি, একজনের গলা ধরে ঝুলচিস !

চোখে কটাক্ষ···মালভা বললে,—তোমার গলা ধরে কবে ঝুলেছি যে এ কথা বলছো !

—আরে, না, না, আমার গলা ধ'রে ঝুলবি কেন ? সে কথা কি আমি বলেছি ? তা নয়। তবে সেদিন দেখলুম কি না, ভাসিলির ঐ বাঁদর ছেলে ইয়াকভটার গলা জড়িয়ে আছিস !

—···তোমার খুব রিষ হয়েছে, তাই.. না ?

—ধেৎ ! শোন্ মালভা, আমি স্পষ্ট কথা বলছি—আমার মনে এতটুকু ফন্দীফান্দা নেই !

এই পর্য্যন্ত বলে' সেরিওজকা এগিয়ে এলো মালভার কাছে—এবং স্নেহ-মমতাভরে মালভার কাঁধটা দিলে চাপড়ে। দুজনে পাশাপাশি বসে··· মালভার মুখের ভাব সেরিওজকার নজরে পড়লো না !

সেরিওজকার পানে না ফিরেই গম্ভীর কণ্ঠে মালভা বললে—কি বলতে চাও, বলো ?

—বলছিলুম, ভাসিলিকে তুই ছেড়ে দিয়েছিস ? সত্যি বল্ তো ?

সবলে মাথা নেড়ে মালভা বললে,—আমি জানি না ..

তারপর একটু চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেললো...নিশ্বাস ফেলে মালভা আবার বললে—কিন্তু হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মানে ?

—মানে কিছু নেই···এমনি ! মনে হলো, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

মালভা বললে—ওর উপর আমি ভয়ানক রেগে গেছি।

—হেতু ?

—আমাকে কুকুরের মার মেরেছে।

—বলিস কি ! বিস্ময়ে সেরিওজকার চোখ দুটো হলো বড় বড়। সে বললে,—ভাসিলি তোকে কুকুরের মার মেরেছে ? তুই দিলি তাকে তোর গায়ে হাত তুলতে ?

সকৌতূহলে সেরিওজকা চেয়ে আছে মালভার পানে···উত্তরের প্রত্যাশায়।

গাঢ় কণ্ঠে মালভা বললে—আমি যদি মনে করতুম, তাহলে কি আর আমাকে অমন-মার মারতে পারতো ?

—কিন্তু তুই তাকে এতখানি আস্কারা-দিলি যে বড় ? চুপ করে' পড়ে মার খেলি তুই ! কিছু করলি না ?

—না। ইচ্ছা হলো না !

নিশ্বাস ফেলে সেরিওজকা বললে,—বুঝেছি। বুড়োটাকে তুই সত্যি-সত্যি খুব ভালোবেসে ফেলেছিল্, নাহলে পড়ে পড়ে তার মার খাস, সে ধাত তো ভগবান তোকে স্থান্নি।

কথাটা শেষ করে' সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো সে মালভার মুখে।

হাত নেড়ে সে-ধোঁয়া ঠেলে নির্লিপ্ত উদাস কণ্ঠে মালভা বললে,—তোমাদের কাকেও আমি ভালোবাসি না ··কোনোকালে বাসিনি।

—এ তুই মিথ্যা কথা বলছিস্ কিন্তু, মালভা···

সেরিওজকা হাসলো। মালভা বললে,—মিথ্যা কথা কেন বলবো ? কিসের জন্য বলবো ?

তার স্বরে বেশ দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য্য। সেরিওজকা বুঝলো, না, মালভা মিথ্যা বলছে না। তবু প্রশ্ন করলে,—বুড়োকে ভালোবাসিস না ·· বলছিস·· তাই যদি তো পড়ে পড়ে তার মার খেলি কেন, বলতে পারিস ?

—তাও বলতে পারি না কিন্তু এর জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

মাথা নেড়ে সেরিওজকা বললে—না, তুই আমাকে অবাক করলি ! সাধে বলি আশ্চর্য্যি মেয়ে তুই !

তার পর দুজনে চুপচাপ ..

পৃথিবীর বুকে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। ছোট ছোট কতকগুলো মেঘ জড়াজড়ি করে' মিশে এক হয়ে সাগরের বুকে প্রসারিত ছায়া মেলে ধরলো···ঢেউয়ের মুখে মুখে মৃদু কাকলীর মতো কল-কূজন।

ভাসিলির ঘরের সে আলোটুকু কখন নিভে গেছে! মালভা তবু চেয়ে আছে সেই দিকে অপলক নেত্রে। মালভার মুখে সেরিওজকার অচপল দৃষ্টি ..

সেরিওজকা বললে,—একটা কথা সত্যি করে' আমাকে বলবি, মালভা?

—কি কথা? মালভার কণ্ঠ উদাস...দৃষ্টি অপলক ভাসিলির ঘরের দিকে নিবদ্ধ।

সেরিওজকা বললে— কি তুই চাস?

—তা কি আমি নিজে জানি?

কথাটা সে বললে অতি মৃদু বাষ্পজড়িত কণ্ঠে।

সেরিওজকা বললে— সত্যি, জানিস্ না?

—না!

—এ কিন্তু ভালো কথা নয় মালভা। এই আমাকে ছাখ্ না। আমি যখন যা চাই, তার মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা থাকে না· জেনেই চাই।

তারপর কণ্ঠ হলো মৃদু···সেরিওজকা বললে—তবে দুঃখ এই যে কখনো তেমন কিছু চাইলুম না রে...চাওয়ার মতো কিছু!

করুণ কণ্ঠে মালভা বললে,—আমার মন কিন্তু সব সময়েই কি যেন চাইছে! সে কী, আজো বুঝতে পারলুম না। কখনো মনে হয়, নিরিবিলি ঐ একখানা নৌকোয় আমি একলা বসে থাকবো আমাকে নিয়ে নৌকোখানা ভেসে যাবে দূরে··· অনেক দূরে· যেখানে জন-মানুষের চিহ্ন

নেই...কোনো মানুষের মুখ দেখবো না। আবার মনে হয়, পুরুষ-মানুষদের মুণ্ডুগুলো দিই ঘুরিয়ে! আমাকে ঘিরে তারা সব লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকুক, আর আমি দাঁড়িয়ে মজা দেখি! আবার কখনো মনে হয়, পৃথিবীর পুরুষগুলোকে মেরে তাদের ঝাড় একেবারে নির্মূল করে দিই, তারপর নিজে হই আত্মঘাতী! দুঃখে বেদনায় কখনো পড়ি ঝিমিয়ে, আবার কখনো আমোদে মেতে উঠি। মোদ্দা, এখানকার এই পুরুষমানুষগুলো...সকলকে দেখি, ঘুণধরা নির্জীব কতকগুলো শুক্‌নো কাঠের কুঁদো যেন!

হো-হো করে' হেসে সেরিওজকা বললে—ঠিক বলেছিস, মালভা, এখানকার পুরুষগুলো কি মানুষ? শুকনো কাঠের কুঁদো!

সেরিওজকা একটা নিশ্বাস ফেললো···তার পর মালভার উপর পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' আবার বলতে লাগলো,—এখানকার এই আবহাওয়ার মধ্যে যখন তোকে দেখি, আমার মনে হয়, তুই এখানকার নোস্···এখানে তুই খাপ খাস্ না। মানুষের ভোগের জিনিষ নোস্ তুই! মাছ নোস্, মাংস নোস্, মুর্গী নোস্, মাখন নোস্! তোর মধ্যে কি আছে, জানি না, তবে এটুকু বেশ বুঝি তোর সঙ্গে অন্য মেয়েদের আকাশ-পাতাল তফাৎ!

মালভা শুনলো—শুনে হাসলো···মৃদু হাসির রেখা। হেসে মৃদু কণ্ঠে মালভা বললে—ভগবানের দয়া।

বাঁদিককার গাছগুলোর মাথা ডিঙিয়ে চাঁদ উঠলো আকাশে। সাগরের বুকে ছড়িয়ে পড়লো চাঁদের রূপোলি জ্যোৎস্না-ধারা···তার পর আকাশের নীলিমায় চাঁদ এগিয়ে আসতে লাগলো ধীর পদ-সঞ্চারে। যে কটা নক্ষত্র জলজল্ করছিল, চাঁদের আলোয় তারা হলো ঝিমঝিমে নিষ্প্রভ!

হাসতে হাসতে মালভা বললে—একটা কথা তোমাকে বলবো ?...

—কি ?

—সত্যি, এক-এক সময় আমার মনে হয়, সার-সার ঐ যে সব চালাঘর ওর একখানাতে আগুন লাগিয়ে দিই—দিয়ে মজা দেখি।

দু-চোখে তারিফের দৃষ্টি···হেসে সেরিওজকা বললে—যা বলেছিস্! আমারো মনে হচ্ছে, খুব মজা হয় তাহলে মোদ্দা!···কথাটা বলে' মালভার পিঠটা দিলে চাপড়ে। দিয়ে আবার বললে আরো কি মনে হয় জানিস, মালভা ? তোকে আরো একটি খেলা খেলতে বলি, তাতে আরো বেশী মজা ··

—কি খেলা ?···মালভার চোখে সস্মিত কৌতূহল।

—ঐ ইয়াকভ ছোকরাটার বুকে তুই বেশ আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিস···না ?· · বুক ওর দাউ-দাউ করে জ্বলছে একেবারে! গন্‌গনে উনুনের মতো···শোন্···ওকে লেলিয়ে দে ওর বুড়ো বাপের পিছনে! ভারী মজা হবে। দুটোতে আঁচড়-কামড় যা লাগবে···তার কাছে বুনো ভাল্লুকের লড়াই কোথায় লাগে!···বুড়োকে খানিকটা উস্কে দে তারপর তার বাচ্ছাটাকে! ব্যস, 'পরে আমি দেবো সে আগুনে ফুঁ! কি মজাই হবে! হাঃ হাঃ হাঃ!

মুখে মৃদু মধুর হাসি···মালভা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে সেরিওজকার পানে...দিনের রৌদ্রে সেরিওজকার মুখখানা দেখায় কর্কশ রূঢ়, এখন চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে মানুষের মতো···মোলায়েম, মায়া-মমতায় ভরা। ও-মুখে এখন হিংসা বা শয়তানীর বাষ্প নেই! ঠোঁটে দুষ্ট হাসি থাকলেও মুখখানা সরল, সহনীয়।

মালভা বললে—ওদের উপর তোমার এত রাগ কেন ?

—রাগ! উঁহু...ভাসিলির উপর আমার একটুকু রাগ নেই। নিরীহ, বেচারী! ওর মনটা ভালো···মনে ঘোরপ্যাঁচ নেই! কিন্তু ওর ছেলে? গেঁয়ো বদমায়েস···পেটে পেটে শয়তানী! এই সব গেঁয়োগুলোকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না··যেমন কুড়ে, তেমনি হিংসুটে, খল। গরীব নাচার বলে পায়ে ধরে রুটী পয়সা কিসের না সংস্থান করচে? ওদের একটা ইউনিয়ন আছে ঐ জেম্‌স্‌তভো··এ্যাশেম্বলির মতো। যা কিছু ওদের দরকার, সব জোগায় সেই জেম্‌স্‌তভো।·· ওদের নিজের-নিজের জোৎ-জমি আছে, গোরু আছে, মোষ আছে, ঘোড়া আছে।···জেম্‌স্‌তভোর মেম্বার এক ডাক্তারের কাছে ক'মাস আমি চাকরি করেছিলুম, তাই থেকে ওদের নাড়ী-নক্ষত্র জানতে আমার বাকী নেই! তাছাড়া কত দেশভুঁই ঘুরেছি! পথেই আমার কত বছর কাটলো তো! গাঁয়ে গিয়ে ওদের কাছ থেকে একখানা রুটী চা দিকিনি, বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরে যাবে!·· এক লক্ষ কথা জিজ্ঞাসা করবে তোকে, কে তুমি? কোথায় থাকো? কেন এসেছো? কে তোমাকে চেনে? এমনি লাখো কথা। আমার ভাগ্যে কতবার ঘটেছে! কেউ কেউ আবার মুখের উপর সাফ্ বলবে'খন—চোর! চুরির মতলবে এসেছিস্, বটে। এ কথা বলে গায়ে ইট-পাট্‌কেল ছুড়ে-ছুড়ে মারবে, না হয় পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে। ওদের মনে সব-সময়ে ভয়ানক লালচ আর বিষ! দুনিয়াকে ওরা দেখে বিষ! কিন্তু খুব ভালো করেই জানে, আয়েসে আরামে কি করে বাঁচা যায়। ওদের মস্ত সম্বল হলো জোৎ-জমি! জমির মালিক ওরা! ওদের কাছে তুই আমি তুচ্ছ···নগণ্য!

—তুমিও তো জোত্‌দার?

—না। আমি জোত-জমি পাবো কোথায় যে জোতদার হবো!

আমি সহুবে মানুষ…আমার জন্ম হলো উগলিফ্‌ সহরে।

নিশ্বাস ফেলে মালভা বললে,—আমি জন্মেছি পারলিশে।

সেরিওজকা বললে,—দুনিয়ার কোথাও আমার আপন-জন কেউ নেই। ঐ গেঁয়ো জোতদারগুলো, জানিস্, ওরাই শুধু বাঁচে মানুষের মতো আরামে। ওদের সুখে-দুঃখে দায়ে-অদায়ে দেখতে আছে ওদের ঐ জেমস্‌তভো।

—জেম্‌স্‌তভোটা আসলে কি?

—আসলে…হুঁঃ, ভগবান জানেন, কি! জোতদারদের ভালোর জন্যই জেম্‌স্‌তভোর সৃষ্টি! ওরাই সেটা চালায়। কিন্তু চুলোয় যাক্ জেমস্‌তভো…আমাদের কাজের কথা হোক্…যা বলছিলুম…ঐ মজার খেলা, ত্যাখ্‌ খেলতে রাজী? কারো ক্ষতি হবে না তাতে…দুজনে-খানিকটা ঝাপ্‌টা-ঝাপটি শুধু…ব্যস্‌! ভাসিলি তোকে মেরেছে বলছিলি…ভাসিলির ছেলেকে দিয়ে তুই নে সে-মারের শোধ।

মৃদু হেসে মালভা বললে,—করলে মন্দ হয় না।

—ত্যাখ্‌ ভেবে! তার পর দুজনে লেগে যাবে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই। তুই মুখ থেকে একটি কথা খশাবি শুধু, অমনি ধাঁই-ধড়াধড় লেগে যাবে…একেবারে ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজবে…হাতা বেড়ি, চিমটে নিয়ে লড়াই!

খানিক গম্ভীরভাবে খানিকটা বা পরিহাস-ছলে সেরিওজকা দিলে সবিস্তার বর্ণনা, কি করে’ মালভা এ নাটক রচনা করবে…মালভার ভূমিকাটুকু সেরিওজকা তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে বুঝিয়ে দিলে।

বিবৃতি শুনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মালভা বললে,—যদি সত্যিকাবের সুন্দরী হতুম, ওঃ, কি কাণ্ডই না বাধিয়ে দিতুম…দুনিয়াটাকে ওলোট-পালোট করে ছাড়তুম!

দুজনে যখন উঠলো, চাঁদ তখন আকাশের ঠিক মাঝামাঝি এসে বসেছে আসন পেতে···রাতের শোভা আরো রমণীয় হয়েছে ···সামনে অপার অসীম জলধি···মাথার উপর আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ আর নীলিমা জুড়ে নক্ষত্রমণ্ডলী। নীচে বালির অথৈ বিস্তার···উইলোর ঘন ঝোপ···বালির বুকে দুখানা ঐ জীর্ণ চালা···চালা দুখানা দেখাচ্ছে আনাড়ির হাতের তৈরী দুটো কফিন যেন। বিশাল বিপুল সাগরের পাশে এগুলোকে কত তুচ্ছ মনে হচ্ছে!

চালায় বসে বাপ আর ছেলে পরমানন্দে ভডকা পান করছে। সহরে গিয়েছিল ইয়াকভ; সেখান থেকে ভডকা এনেছে। বাপকে দিয়ে তোয়াজ করবে, বাপের মন ভডকায় যদি ভিজিয়ে নরম করতে পারে, এই অভিপ্রায়! সেরিওজকা আগে এক সময় ইয়াকভকে খবর দেছে, মালভার ব্যাপার নিয়ে ভাসিলি ছেলের উপর রাগে অগ্নিশর্ম্মা! বাপ বলেছে, মালভাকে মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দেবে! সেই ভয়ে মালভা মোটে ঘেঁষছে না ভাসিলির দিকে···সরে সরে লুকিয়ে লুকিয়ে আছে। আর ইয়াকভের সম্বন্ধে ভাসিলি বলেছে···যে-ছেলে এমন বেয়াদব, তার সে-বেয়াদবির এমন সাজা দেবে যে বাছাধনকে আর টুঁ-শব্দ করতে হবে না!

এ-কথা শুনে বাপের উপর ইয়াকভের মন রাগে তেতে আছে.. এমন তাত্ যে সে-তাতে ইয়াকভ দুনিয়াটাকে পুড়িয়ে ছাই করতে পারে! বাপ তো কখানা বুড়ো হাড়ের গোছা!

তার উপর মালভা! সে যেন খেলা পেয়েছে! হেসে কখনো ইয়াকভের গায়ে ঢুলে পড়বে···আবার কখনো সরে লুকিয়ে

থাকবে! এতে ইয়াকভের মন আরো দুর্বার দুর্জয় হয়ে উঠেছে লোভে···মালভাকে তার পাওয়া চাই...পেতেই হবে মালভাকে! মালভার জন্য ইয়াকভের জীবন-পণ!

বাপকে ইয়াকভ বুঝে নিয়েছে। ইয়াকভের সুখের পথে বাপ কাঁটা! এ কাঁটা যেমন করে হোক তুলে সে সরাবে! মালভাকে পাবার জন্য সে তা করবেও!

বাপের পাশে বসে ভড্‌কা পান করলেও ইয়াকভের মন সর্ব্বক্ষণ উদ্যত হয়ে আছে···বাপ একটু ইঙ্গিত দিলে হয়···তখন সে যা করবে···

দু-বোতল নিঃশেষ করেছে দুজনে বসে কেউ একটা কথা করনি, ফিশারীর সম্বন্ধে ছোটখাট দু-চারটে মন্তব্য করা ছাড়া!

নিরালা নির্জ্জন ঘর—দুজনে বসেছে সামনা-সামনি। ভডকা যত খাচ্ছে, দুজনের বুকে বারুদের আগুন তত প্রধূমিত হচ্ছে! প্রচণ্ড তার প্রসার। বুকের মধ্যে দুজনেই বারুদ জড়ো করছে! দুজনই বুঝছে, আগুনের ছোট্ট একটু ফুলকি··তারপর এ-বারুদ জ্বলে উঠে লঙ্কা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে!

বাতাসে চালের কতকগুলো আলগা খড়-নড়ার খশখশ্‌ শব্দ··· আর দূর থেকে আসছে সাগরের গর্জ্জন-রব।

হঠাৎ মুখ তুলে ভাসিলি তাকালো ইয়াকভের পানে...প্রশ্ন করলো —সেরিওজকা এখনো আড্ডায় বসে মদ গিলছে, বোধ হয়?

—হ্যাঁ, এ ছাড়া ওর আর কি কাজ আছে রাত্রে? গ্লাসে আবার ভডকা ঢালতে ঢালতে ইয়াকভ দিলে জবাব।

ভাসিলি বললে,—মদেই ওর মরণ লেখা আছে! তবে হাঁ, একেই বলে বাঁচা··কোনো-কিছুতে ভয়-ডর নেই। তুমিও ওর জুড়ি তৈরী হচ্ছো!

রুক্ষ স্বরে ইয়াকভ বলে উঠলো—কক্‌খনো না।

—আবার না! ভাসিলি ভেংচে উঠলো, বললে—আমি সব জানি। যা বলছি, এর একবর্ণ মিথ্যা নয়। এখানে এসেছো···তিন মাস। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়···এবার তুমি বাড়ী ফিরবে। কত টাকা তোমার চাই বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য?

কথাটা শেষ করে ভাসিলি ভডকার গ্লাস তুললো মুখে···দাড়িগুলো গুছি করে পাত্রটা উপুড় করলো ··করে' গলায় ঢাললো ভডকা।

ইয়াকভ বললে—দুমাস চাকরি। দু-মাসে ক পয়সা আর জমে!

—তাই যদি তো এখানে পড়ে থেকে ভ্যারেণ্ডা-ভাজার দরকার? তলপী তুলে সোজা বাড়ী ফেরো।

মনে-মনে ইয়াকভ হাসলো, কোনো জবাব দিলে না।

বাপ তখন বেশ কড়া গলায় বললে,—এখানে তোমার পড়ে থাকবার কোনো মানে দেখি না। কেন থাকা, শুনি?

ইয়াকভ হাসলো। সে-হাসি দেখে ভাসিলির গা জ্বলে উঠলো। ভাসিলি বললে,—বাপ কথা বলছে, সে কথা তুচ্ছ করে হাসি! তোমার আস্পর্দ্ধা ভয়ানক বেড়েছে ইয়াকভ, এই বয়সেই বড্ড বেশী স্বাধীনতার চর্চ্চা করছো! মনে রেখো, এক মিনিটে তোমাকে টিট্ করে দিতে পারি।

গেলাসে ভডকা ঢেলে ইয়াকভ নিঃশব্দে সেটুকু নিঃশেষ করলে··· বাপের কথার খোঁচায় বুকের আগুন জেগে জ্বলে উঠলো...তবু রাগলে বাপের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না · বাপের পানে তাকালো, অলক্ষ্যে···কুণ্ঠিত দৃষ্টি·· দেখলো, বাপের চোখে রাগের অগ্নিশিখা।

বাপের কথা তুচ্ছ করা! বাপের কথার জবাব না দিয়ে ভডকা গেলা! বাপকে এত অমান্য···ভাসিলির বুকের আগুন তীব্র জ্বলে উঠলো। সগর্জ্জনে ভাসিলি বললে,—বাপ বলছে বাড়ী যেতে, তার জবাব নেই!

মদ গিলেচো ! বাপের কথায় তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের হাসি। শোনো···আমার হুকুম, সামনের শনিবারে এখানকার চাকরি খতম করে' রবিবার ভোরে তুমি বাড়ী ফিরবে। শুনেছো···বুঝেছো আমার কথা ?

মাথা নেড়ে বেশ উদ্ধত কণ্ঠেই ইয়াকভ বললে,—না, এখান থেকে আমি যাবো না।

—যাবে না ? হুঁ ! বলে ভাসিলি উঠে দাঁড়ালো, বললে—কার সঙ্গে তুমি কথা কইছো, জানো ? বাপের মুখের উপর করো কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ—এমন তোমার বুকের পাটা ! ভুলে গেছ আমাকে··· ভুলে গেছ তোমার কি-হাল আমি করতে পারি !

রাগে ভাসিলির সর্ব্বশরীর কাঁপছে···মুখ অসম্ভব রাঙা হয়ে উঠেছে। বাপের পানে না চেয়ে কণ্ঠ একটু মৃদু করে ইয়াকভ বললে—আমি কিছুই ভুলে যাইনি—কিন্তু তুমিও সব ভুলে যেয়োনা···নিজের কথা একটু মনে কোরো।

—কী ! আমাকে তুই দিবি উপদেশ ! জানিস, তোকে আমি চোখের পলকে গুঁড়িয়ে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারি ?

এ কথা বলে ভাসিলি তুললো বজ্রমুষ্টি ইয়াকভকে লক্ষ্য করে'। খপ করে বাপের হাত চেপে ধরে ইয়াকভ উঠলো দাঁড়িয়ে...বেশ উদ্ধত কণ্ঠে দিলে জবাব,—আমার গায়ে হাত দেবেনা বলছি, খবর্দ্দার—এ তোমার গাঁয়ের ঘর পাওনি।

—কী ! আমাকে চোখ রাঙাস ! গাঁয়ের ঘর না-ই হলো... আমি বাপ, তুই ছেলে।

—বাপ বলে' অকারণে যখন খুশী মারবে, তা হবে না ! এ তোমার

গাঁ নয় যে পুলিশ ডেকে আমায় ফাঁড়িতে পুরে ডাণ্ডা খাওয়াবে! এখানে তুমি যে, আমিও সে। তোমার তম্বি আমি এখানে সহ্য করবো না।

ভাসিলি হতভম্ব—রাগের আগুনে দুচোখ সিঁদুরের মতো রাঙা—জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে··· নিশ্বাসে ভডকার কটু তীব্র গন্ধ।

ইয়াকভ একটু সরে দাঁড়ালো · মাথা নীচু করে বাপের আক্রমণ প্রতিরোধে উদ্যত···বাহিরে প্রশান্ত ভাব···সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত···দুজনের মাঝখানে আড়াল সেই আধখানা করে কাটা পিপেটা।

শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়তে-উদ্যত বেরালের মতো ভাসিলি তুললো হুঙ্কার,—আমি যে, তুমিও সে! বটে! এখানে তোমাকে শাসন করতে পারবো না আমি?

—না। ইয়াকভ বললে পরুষ কণ্ঠে,—এখানে তুমি-আমি সবাই সমান।

—হুঁ! এ জ্ঞান কবে থেকে হলো?

—তাছাড়া তোমার এত গায়ের জ্বালা কেন, আমি বুঝিনা, ভাবো? তুমি আমাকে কেন তাড়াতে চাও এখান থেকে—আমি জানি তার কারণ। আমি এখন কচি খোকা নই।

অসহ্য বেয়াদবি! বাঘের মতো ভাসিলি ঝাঁপিয়ে পড়লো ইয়াকভের উপর···পড়ে কিল-চড় ঘুষি-লাথি চালালো পাগলের মতো··· অজস্র, বিরামহীন। ইয়াকভও ছাড়বার পাত্র নয়...ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সে রুখে দাঁড়ালো। ঘুষি বাগিয়ে ভাসিলি আবার মারবে,...বাপের হাতখানা সবলে চেপে ধরে বাপকে ঠেলে ইয়াকভ বললে—খবর্দ্দার!

—দেখাচ্ছি তোর খবর্দ্দারের মজা!

—মারবে না বলছি, আমাকে···এখনো বলছি···হুঁশিয়ার! বাপ

বলে আমি এতটুকু রেয়াৎ করবো না, বলে দিচ্ছি।

—বাপকে তুই চোখ রাঙাবি, বেয়াদব বাঁদর! আজ তোর এক-দিন, কি, আমার একদিন!

চালাখানা ছোট···সেজন্য দুজনের অসুবিধার সীমা নেই। ধাক্কা-ধাক্কি, ঠোকাঠুকি, জড়াজড়ি করে দুজনে কখনো পড়ে নুনের ডাঁই-করা বস্তাগুলোর উপর, কখনো পড়ে পিপের গায়ে···কখনো বা ছ্যাঁচা বেড়ায়···সমস্ত চালাখানা কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠচে!

ঘুষি-লাথি-চড় খেয়ে বিবর্ণ মুখে দাঁতে দাঁত চেপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ইয়াকভ একটু সরে গিয়ে বাপের পানে তাকালো··দু'চোখে ক্ষুধিত নেকড়ের দৃষ্টি! বাপ ঘুষি পাকিয়ে মাথা বাঁকিয়ে ছেলেকে দিচ্ছে গালাগাল···অকথ্য-কুকথ্য অজস্র গালাগাল!

বুনো শূয়োরের গোঁ নিয়ে ভাসিলি আবার হঠাৎ লাফিয়ে পড়লো ইয়াকভের ঘাড়ে—ইয়াকভ এর জন্য ছিল প্রস্তুত,—সবলে বাপকে ধাক্কা দিয়ে ইয়াকভ ফেলে দিলে। ফেলে দিয়ে ইয়াকভ বললে,—আর নয়! এখনো বলছি, থামো, না হলে...

ধুলো মেখে ভাসিলি উঠে দাঁড়ালো; এবং ইয়াকভের উপর পড়ে আবার অজস্র চড় আর ঘুষি।

ইয়াকভ বাপের গায়ে হাত তোলেনি, শুধু মার ঠেকিয়েছে প্রাণপণে। এবারে সে গর্জ্জে উঠলো—তুমি ক্ষেপে গেছ! ক্ষেপেছো। এখনো বলছি, থামো, কেন মিছে প্রাণটা খোয়াবে?

—কী, আমাকে তুই খুন করবি? এত শক্তি! বেশ, আয়, কর্ খুন।

আবার ছুটোপাটি চললো—ঘাড়াঘাড়ি...গড়াগড়ি···চুলোচুলি··· লাথালাথি···

তারপর কোনো মতে বাপকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ইয়াকভ গেল চালা-ঘর থেকে বেরিয়ে···এক-রকম ছুটে···বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে!

ভাসিলি উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে ছেলেকে উদ্দেশ করে কদর্য্য গালি বর্ষণ করতে লাগলো।

অবসাদে ক্লান্তিতে দেহ অবশ···সর্ব্বাঙ্গে বেদনা···দরদর-ধারে ঘাম ঝরছে···তার নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে!

বেরিয়ে ইয়াকভ এলো সাগরের কূলে···এসে ডাঙ্গায়-রাখা একখানা নৌকোর উপরে উঠে বসলো। জামার হাতা ফেঁশে গেছে··· গলার কাছে শুধু এক-ফালি সুতো···ঢিলে পায়জামার খানিকটা ছিঁড়ে ঝুলছে ভিক্ষার ঝুলির মতো...বাপের উপর ঘৃণায় মন কাণায় কাণায় ভরা।

ভাসিলিও এলো চালা থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে। এসে সে বসলো বালির উপর।

ইয়াকভ চেয়ে দেখলো, ভাবলো, বাপের দেহে হাতীর বল বলে' জানতো। কিন্তু কোথায়? শুধু ঢিপসী! ইয়াকভ যদি ও-মারের পাল্টা জবাব দিত, বাপের শরীরখানা আস্ত থাকতো না, চুর হয়ে যেতো! নিজের শক্তি-সামর্থ্য কতখানি, জেনে মনে-মনে খুশী হলো ইয়াকভ। বাপের পানে চেয়ে মনে-মনে বললে, বাপ বলে মান্য আদায় করবে গায়ের জোরে···ভয় দেখিয়ে? ভারী আমার বাপরে!

ভাসিলি দেখলো ইয়াকভকে···চেঁচিয়ে আবার কতকগুলো গাল দিলে ছেলেকে উদ্দেশ করে।

ইয়াকভ চুপ করে' থাকতে পারলো না···বাপের দিকে চেয়ে সেও উঠলো চেঁচিয়ে—যত পারো, গাল দাও···নিজেকে শুধু ক্ষয় করবে···

এ-বয়সে ও রাগ, অমন ঝাঁজ···মরণের লক্ষণ।

ভাসিলি বসে থাকতে পারলো না। দেহ-মন জ্বলছে...অসহ্য জ্বালা। উঠে সে চললো ইয়াকভের দিকে···বললে,—খবর্দ্দার, আমার বাড়ীতে আর কক্‌খনো তুই ঢুকবি নে! আমি তোর মুখদর্শন করতে চাইনে।

—বেশ! কিন্তু এখান থেকে আমি নড়বো, স্বপ্নেও ভেবো না তুমি! সে-বাড়ীতে ফিরতে চাই না। আমি এইখানে থাকবো···এই চাকরি নিয়ে। এখানে ঢের আরাম! বাড়ীতে···সেখানে অনেক ল্যাঠা, অনেক দায়···কে ফিরছে সেখানে?

কথা শেষ করে বাপের পানে চেয়ে ইয়াকভ হো-হো করে হাসতে লাগলো। সামনে পড়ে নৌকোর কখানা ভারী দাঁড়···তার একখানা তুলে ভাসিলি তেড়ে গেল ইয়াকভের দিকে—তোকে আজ আমি আস্ত রাখবো না···তোর রক্ত দেখবো আজ! বেয়াদব কুত্তাকি বাচ্ছা!

নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে ইয়াকভও গুটোলো তার আস্তিন। তাকে তাগ করে ভাসিলি দাঁড়খানা ছুড়লো তীরের মতো·· সে দাঁড় ইয়াকভকে স্পর্শ করলেনা···ইয়াকভ ততক্ষণে অনেক দূরে সরে' গেছে...নাগালের বাহিরে। পিছন ফিরে ইয়াকভ দেখলো। তারপর আর একবার হো-হো করে হেসে সে চললো দূরে...অনেক দূরে··· শেষে বড় বড় বালির ঢিপিগুলোর পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলের দিকে চেয়ে ভাসিলি দাঁড়িয়ে আছে. যেন কাঠ! ছেলে চোখের আড়াল হলে ভাসিলির সম্বিৎ ফিরলো। সম্বিৎ ফিরতে টের পেলো সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা···বেল্টটা খশে ঝুলছে···সমস্ত দেহ যেন ভারী পাথর!

টলতে টলতে টলতে টলতে ভাসিলি ফিরলো তার চালায়···আসতে

আসতে কতবার যে হুঁচোট খেয়েছে!

ঘরে এসে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো। ভডকার বোতল দুটো ঐ পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো। একটা এখনো ছিপি-আঁটা, মোটে খোলা হয়নি। সেটার ছিপি খুললো; ছিপি খুলে বোতলের মুখটা দু' ঠোঁটে চেপে ধরলো। দাঁতে ঠুকে গেল বোতলটা...সফেন ভডকার খানিকটা গেল পড়ে ভাসিলির কষ্ বয়ে।

কাণ দুটো তার ভোঁ-ভোঁ করে উঠলো···বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ভয়ানক জোরে দুলচে···পিঠে ভয়ানক ব্যথা। মনে হলো, বুড়ো! হাঁ., বুড়ো হয়েছি আমি! তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে মেঝেয় চ্যাটাইয়ের উপর লুটিয়ে পড়লো···নিস্পন্দ, অসাড়!

খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অসীম নীল সাগর···সাগরের বুকে তরঙ্গের লীলারঙ্গ। জলের দিকে অনেকক্ষণ···অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো ভাসিলি···উদাস চোখ···কাণে বাজছে ইয়াকভের সেই কথাগুলো··· জল না হয়ে যদি মাটী হতো...আমাদের কালো মাটী, আর সে-মাটীতে যদি লাঙ্গল দিতে পারতুম!

গভীর অবসাদে ভাসিলির দেহ-মন আচ্ছন্ন···উঠে বসে সবলে বুকে দু-হাত ঘষলো, তার পর মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললো। মাথা তুলে কিছুতে খাড়া রাখতে পারে না···বুকখানা ঝুঁকে পড়ছে···মাথায় পাহাড় চাপানো···নিশ্বাস কেবলি বন্ধ হয়ে আসে! বার-বার কাস্‌লো···গলা যদি সাফ হয়! তারপর আবার পড়লো মেঝেয় লুটিয়ে।

শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখচে···মনে দুশ্চিন্তার জমাট অন্ধকার।··· এক চরিত্রহীনা মেয়ের জন্য নিজের স্ত্রীকে ভুলে এখানে সে পড়ে

আছে…হু'দিন নয়, দশ দিন নয়…পাঁচ পাঁচ বচ্ছর! ভোলা কি, স্ত্রীকে এক রকম ত্যাগ করেই এসেছে! একদিন যে-স্ত্রী তার সংসারটিকে গড়ে তুলেছে ভাসিলির সুখের জন্য! আরামের জন্য নিজের দেহ-মন যে-স্ত্রী বিসর্জ্জন দেছে…নিজের সুখ নিজের দুঃখ বলে যে কখনো একটা নিশ্বাস ফেলেনি…প্রাণপাত করে নিঃশব্দে খেটে আসছে! মহাপাপ করেছে ভাসিলি! ভগবান তাই সে মহাপাপের সাজা দিলেন আজ! ডাগর ছেলে…ছেলের উপর তার কত আশা, কতখানি ভরসা…সেই ছেলে এমন বিগড়ে উঠেছে যে বাপকে চরম অপমান করে! বাপকে অমন শ্লেষ বিদ্রূপ! এর চেয়ে মরণ ছিল ভালো…লাখো গুণে ভালো!

এ শ্লেষ, এ বিদ্রূপ কিসের জন্য? কার জন্য? তার পাপের সঙ্গিনী ঐ পাপীয়সী কুলটা মালভার জন্য! ভাসিলির বয়স হয়েছে! বুড়ো হয়েছে…এ বয়সে ঐ কুলটার জন্য ভাসিলি নিজের স্ত্রীকে ভুলে সংসার ভুলে এখানে পড়ে আরাম করছে! হা ভগবান! ভাসিলির চোখে জলধারা! নিশ্বাস ফেলে ভাসিলি দু-হাতে মুছলো চোখের জল।

সূর্য্য কখন সাগরের বুকে ডুবে গেছে…তার শেষ রশ্মিটুকুও অন্ধকারে মিশে উবে গেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ…দূর দুরান্তর থেকে ঈষৎ-তপ্ত বাতাস এসে গায়ে লাগছে! দুঃখে…অনুশোচনায় গ্লানিতে ভাসিলির মন পরিপূর্ণ…অশ্রুসিক্ত।

ও-ঘটনার দুদিন পরে, আরো কজন জেলের সঙ্গে ইয়াকভ বেরুলো স্টীমারের-সঙ্গে-বাঁধা প্রকাণ্ড নৌকোয়…পনেরো মাইল দূরে ষ্টার্জ্জন মাছ

ধরতে। পাঁচ দিন পরে ফিরলো···একা···ছোট একখানা নৌকোয়। কী-সব কাগজ-পত্র নিয়ে যেতে হবে তাকে, তার জন্য আসা।

এসে সে নৌকো থেকে নামলো...বেলা তখন দুপুর···জেলেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করছে। রোদে সেদিন কী ভয়ানক ঝাঁজ! তপ্ত বালিতে পা পাতবার জো নেই—সদ্য ফোস্কা হবে। তার উপর বালিতে মাছের কাঁটা আর আঁশ যা ছড়িয়ে আছে, তাতে পা কেটে রক্তারক্তি ব্যাপার!

সাবধানে পা ফেলে কোনোমতে ইয়াকভ এলো চালায়। বুট জুতো নিয়ে যায়নি বলে' নিজেকে শাপমন্যি দিতে দিতে।....

তার পর খাওয়া-দাওয়া চুকলে কাগজ-পত্র নিয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছা আর হলো না ...যা কষ্ট! তাছাড়া মালভাকে ক'দিন দেখেনি··· দেখবার জন্য মন আকুল, অধীর। বাহিরে গিয়ে এ ক'দিন মালভার কথাই ভেবেছে! মালভাই ধ্যান-জ্ঞান—সে এখন কি করছে? কোথায়? তাকেও ভাসিলি এমন মার দিলে কিনা এই চিন্তায় তার ক'দিন কেটেছে! মন এখন মালভার কাছে ছুটেছে! মালভাকে ভাসিলি কি বলেছে...মালভাই বা তাকে কি বলেছে এ সব খবর না পেলে ইয়াকভের মন সুস্থির হচ্ছে না। মালভাকে ভাসিলি হয়তো খুব ঠেঙিয়েছে!

তা যদি হয়, মঙ্গল! মার খেলে মালভা নিশ্চয় আর বাপের ত্রিসীমায় ঘেঁষবে না! মালভাকে পাবার রাস্তা পাকা হবে ইয়াকভের।···মালভাকে পাওয়া চাই! মালভাকে না পেলে ইয়াকভের জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে!

সারা ফিশারী নিঝুম···কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। চাল

ঘরগুলোর জানলা খোলা, মনে হচ্ছে, ভীষণ গরমে হাঁ করে যেন নিশ্বাস নিচ্ছে! ঘরগুলোর পিছনে এজেণ্টের অফিস···সেখান থেকে একটা ছেলের কান্না আসছে ভেসে। ছেলেটা প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে। পিপেগুলো যেখানে ডাঁই হয়ে আছে, সে দিকে মানুষের গলা শোনা গেল... খুব চাপা গলায় কারা কথা কইছে!

সাহসে ভর করে' ইয়াকভ এলো পিপেগুলোর সামনে! ভেবেছিল, মালভাকে দেখবে। দেখলো তাই। কিন্তু মালভা একা নয়··· তার সঙ্গে সেরিওজকা আছে, ভাসিলিও আছে। সেরিওজকা আছে কাৎ হয়ে শুয়ে···এবং সেরিওজকার এক-দিকে বসে ভাসিলি, আর এক দিকে বসে মালভা।

দু' পা হঠে ইয়াকভ সরে এলো। ভাবলো, তিনজনের কিসের মিটিং চলেছে এখানে? কাজকর্ম্ম ছেড়ে বাপ এসেছে? মালভাকে চৌকি দিতে···পাছে ইয়াকভ ঘেঁষে তার দিকে? বাপের এমন মতিচ্ছন্ন হয়েছে?···বাপের উপর ইয়াকভের মার কী বিশ্বাস! বাপের এ কীর্ত্তির কথা মা যদি শোনে?···ভাবলো আমাকে ওরা দ্যাখেনি! যাবো ওদের সামনে? দেখা দেবো?

সেরিওজকার কথা কাণে এলো—সনিশ্বাসে সেরিওজকা বললে,—তুমি তাহলে তাই ঠিক করেছো! এখানকার কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরবে!···ভালো, সেখানে গিয়ে নিজের জোত-জমি দেখা, চাষবাস করা···তা যদি পারো, ভালোই তো।

ইয়াকভের মন আনন্দে নেচে উঠলো।

ভাসিলি দিলে জবাব···বললে,—হুঁ···আমি মন ঠিক করে ফেলেছি···বাড়ী ফিরে যাবো।

ইয়াকভ আর নেপথ্যে থাকতে পারলো না...এগিয়ে এসে দেখা দিয়ে বললে—সাধু-সজ্জনে নমস্কার!

ভাসিলি ফিরে তাকালো ত্বরিত দৃষ্টিতে।...ইয়াকভকে দেখবা মাত্র দৃষ্টি ফেরালো। ইয়াকভের দিকে মালভা ফিরেও তাকালো না—সেরিওজকা পা মুড়ে উঠে বসলো। বসে গম্ভীর কণ্ঠে বললে—হুঁ, এই যে আমাদের সুপুত্তুর ইয়াকভ বাবাজী! অনেক দূরের পাড়ি সেরে ফিরেছেন! কীর্ত্তিমান ছেলে! কশাই ডাকিয়ে ওর গায়ের ছালখানা যদি ছাড়িয়ে নেওয়া যায়...ওর ছালে জাল তৈরী হয় চমৎকার!

মালভা মৃদু হাসলো।

ইয়াকভ বসলো...বসে বললে—রোদের কি ঝাঁজ আজ। উঃ!

ভাসিলি চাইলো ইয়াকভের পানে...চেয়ে শান্ত সহজ স্বরে বললে,—তোমার জন্য আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।

বাপের কণ্ঠ এমন কোমল! মুখখানাও তেমন রুক্ষ কঠিন নয়।

ইয়াকভ বললে—হ্যাঁ, আমি এসেছি সকলের খাবার-দাবার নিয়ে যাবো বলে।—তার পর সে তাকালো সেরিওজকার দিকে, বললে—সিগারেটের জন্য আমাকে একটু তামাক দিতে পারো?

সুদৃঢ় কণ্ঠে সেরিওজকা বললে,—তোমাকে দেবো তামাক? একটি টুকরোর প্রত্যাশা করো না ছোকরা।

আঙুল দিয়ে বালিতে রেখা টানতে টানতে ভাসিলি বললে,—আমি বাড়ী ফিরছি ইয়াকভ।

নিরীহ নিরপরাধের ভঙ্গীতে ইয়াকভ বললে—সত্যি?

—হুঁ...ভাসিলির স্বর গম্ভীর। ভাসিলি বললে—তুমি? এইখানেই

থাকবে?

—হুঁ। থাকতেই হবে আমাকে। তার কারণ, গাঁয়ে দুজনের মতো কাজ নেই।

—বেশ, তুমি তাহলে এইখানেই থাকো, আমার বলবার কিছু নেই। বড় হয়েছো···নিজে যা ভালো বুঝবে, করবে। শুধু একটা কথা মনে রেখো···আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে · আমি আর ক'দিন! হয়তো মরবো না, বেঁচেই থাকবো। তবে কাজ করবার সামর্থ্য আর কতখানি আছে, বুঝছি না।···জোতের কাজ, চাষের কাজ···অনভ্যাস হয়ে গেছে তো। যাই হোক,···হুঁ...আর একটি কথা ভুলো না, বাড়ীতে তোমার মা এখনো বেঁচে আছে।

এ সব কথা বলতে ভাসিলির খুব কষ্ট হচ্ছিল। কণ্ঠকে কে যেন চেপে-চেপে ধরছে ..দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে কথাগুলো বললে··· তার হাত কাঁপছে।

মালভা অপলক চোখে চেয়ে আছে ভাসিলির দিকে···সেরিওজকা এক চোখ কুঁচকে আর এক চোখ বড় করে ইয়াকভকে পর্য্যবেক্ষণ করছে অন্তর-ভেদী সন্ধানী দৃষ্টিতে। ইয়াকভের বুকের মধ্যে মুক্তির আর আরামের ধারা ঝরছে ঝর্ঝর রবে ভিতরটা হাসিতে ঝক্ঝক্ করছে, আর সে আছে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে···বুকের ভিতরকার এ-হাসি ঠোঁটে না উথলে ওঠে আনন্দের আলো-ঝর্ণায়!

ভাসিলি নিশ্বাস ফেললো—নিশ্বাস ফেলে আবার বললে— যাই করো এখানে, তোমার মায়ের কথা একেবারে ভুলে থেকোনা। মনে রেখো তুমি তার এক সন্তান।

বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়ে ইয়াকভ বললে—অত উপদেশ আমাকে

না দিলেও চলবে!

—হুঁ...এমন হুঁশিয়ার তুমি! ভালো...ভালো! কথাগুলো বলা আমার কর্ত্তব্য, তাই বলা।

এটুকু বলে আর একটা নিশ্বাস...সুগভীর নিশ্বাস। তার পর চারজনেই চুপচাপ—কারো মুখে কথা নেই।

অনেকক্ষণ......

শেষে মালভা বললে—ওদিককার নৌকো বোধ হয় এখনি ছাড়বে... ফিশারীর ছুটির ঘণ্টা বাজতে বেশী দেরী নেই।

—হ্যাঁ...আমি এই উঠছি! বলে ভাসিলি উঠে দাঁড়ালো...সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠলো।

—তাহলে আসি সেরিয়া...ভলগার ওদিকে কখনো যদি যাও... দেখা করো...ভুলো না।...ভোলোসভ জানো তো?...জেলা সিমব্রিস্ক... নিকোলো লিভোসকায়ার গাঁ। জেলার বড় সহর হলো ভোলোসভ। আমাদের গাঁয়ের নাম মালশো...সহর থেকে মোটে দু-মাইল দূরে! সেখানে গিয়ে যাকে আমার নাম বলবে, সে-ই বাড়ী দেখিয়ে দেবে।

থাবার মতো লোমশ কর্কশ হাতে ভাসিলির হাতখানা চেপে ধরে সেরিওজকা যেন গর্জ্জন ছাড়লো! বললে—ওদিকে গেলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করে আসবো ভাসিয়া....

—খুব বড় সহর। তা হোক, গাঁয়ের সন্ধান নিতে এতটুকু বেগ পেতে হবে না। কথাটা ভাসিলি বললে আর-একবার ভালো করে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি ঠিক যাবো'খন দেখো।

—তাহলে আমি আসি। গুড বাই। ভাসিলির কণ্ঠ বাষ্পার্দ্র, স্বর স্খলিত।

—গুড বাই বৃদ্ধ বন্ধু।...

ভাসিলির চোখে বাষ্পের উচ্ছ্বাস... মালভার পানে চেয়ে ভাসিলি বললে,—গুড বাই মালভা...

মালভারও দু চোখ সজল... ব্লাউশের হাতায় চোখ রগড়ে মুছে নিঃশব্দে ভাসিলির বুকে সে মাথা রাখলো...তার পর ভাসিলির কপোলে অধরে...তিনটি করে' ছটি চুমু দিলে।

ভাসিলি একটু অপ্রতিভ হলো! কি সে বললে—অর্দ্ধস্খলিত স্বর।

ইয়াকভ জ্বলে উঠলো! মনে মনে বললে, কত ঢঙ্‌ই জানো!

সেরিওজকা তাকালো আকাশের পানে—তার পর একটা হাই তুলে বললে—তপ্ত বালির উপর দিয়ে হেঁটে নৌকোয় উঠতে হবে—পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়বে।

মৃদু হেসে ভাসিলি বললে,—তপ্ত বালি পায়ে সয়ে গেছে ভাই—কড়া-পড়া পা...ফোস্কা পড়বে না। আসি ইয়াকভ, গুড বাই।

ইয়াকভ বললে—গুড বাই।

ক'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে...চলতে হবে, সে কথা যেন ভুলে গেছে।...

গুড বাই! এই ছোট দুটি কথার পুনরুক্তিতে আবহাওয়া এমন করুণ হলো, কারো আর চেতনা নেই! ইয়াকভের মনের আগুন গেছে নিবে। বাপকে বিদায় দেবার সময়...ভাবলো, মালভার মতো বাপকে বুকে জড়িয়ে ধরবে? না, বাপের হাতখানা নিজের হাতে চেপে সম্ভাষণ জানাবে...সেরিওজকা যেমন জানিয়েছে?...লজ্জা হলো। কোনো কিছু করলে না, শুধু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ইয়াকভ।

ছেলেকে স্তব্ধ, স্থির থাকতে দেখে ভাসিলির বুকখানা ব্যথায় দুলে

উঠলো ··বাপের উপর ছেলের স্নেহ না থাকুক···যার স্নেহের আশ্রয় পেয়ে এত বড় হয়েছে, তার উপর এতটুকু কৃতজ্ঞতা থাকবে না? ভাবলো, নারীর মোহ এমনি বটে!...ইয়াকভের উপর বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় ভাসিলির মন ভরে উঠলো।

ছেলের পানে চেয়ে ভাসিলি আর একবার বললে—আচ্ছা, তাহলে শেষ-বারের মতো আসি···মোদ্দা ইয়াকভ, তোমার মায়ের কথা ভুলো না।

এ-কথায় ইয়াকভের মন আবার তিক্ত হলো। কঠিন রূঢ় স্বরে সে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলবো না। এর জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। মার উপর আমার যা কর্ত্তব্য, তার কোথাও একটু ত্রুটি ঘটবে না। এর জন্য কারো উপদেশের দরকার হবে না।

—ভালো কথা।—আচ্ছা, তাহলে আমি আসি।...ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।···অনেক দোষ-ত্রুটি করেছি, সেরিজা, মাপ করো, ভুলে যেয়ো। কখনো-কখনো আমার কথা মনে করো।...মালভা, তোর উপর অনেক জুলুম করেছি···সে সব ভুলে যাস...মনে রাখিস্‌নে!

ইয়াকভের অসহ্য লাগছিল, কি সব ন্যাকামি!

এক-পা চললো ভাসিলি—আবার থামলো। থেমে সেরিওজকার পানে চাইলো, বললে—ভালো কথা সেরিয়া, বড় কেটলিটা আছে ঐ সবুজ বোটের পাশে বালির মধ্যে।···সেটা নিয়ো মনে করে।

ইয়াকভের রাগ হলো···ইয়াকভ বললে—সে কেটলি নিয়ে উনি কি করবেন?

ভাসিলি বললে—আমার এ চাকরিতে ও বাহাল হলো কিনা, আজ থেকে···তাই।

ইয়াকভ চাইলো সেরিওজকার পানে···দু চোখে যেমন বিস্ময়···তেমনি হিংসা।· তার পর তাকালো মালভার পানে। মালভা দাঁড়িয়ে আছে নির্ব্বাক···পুতুলের মতো!

মালভার পানে চাইতেই ইয়াকভের বুকে হাজার ঝাড় জ্বলে উঠলো···ভাবী সুখের রঙীন ফানুশ! আনন্দে উচ্ছল ইয়াকভ। এ আনন্দ আভাসে না এরা টের পায়···ইয়াকভ তাই অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

—তাহলে আসি সেরিজা—আসি মালভা···

বার-বার বিদায় নিয়েও ভাসিলির মন এখান থেকে সরতে চাইছে না ..পা দুখানা অবশ···চলবে না, পণ করেছে যেন!

মালভা বললে— চলো, আমি তোমাকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি।

ভাসিলি চললো জলের দিকে···মালভা চলেছে তার পিছু-পিছু। সেরিওজকা বসলো সেখানে বালির বুকে···ইয়াকভ যাচ্ছিল মালভার কাছে...ল্যাঙ দিয়ে সেরিওজকা তাকে বসালো···বসিয়ে প্রশ্ন করলে—তুমি কোথায় চলেছো বৎস?

ইয়াকভের পা তখনো সেরিওজকার পায়ের শৃঙ্খলে···পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে ইয়াকভ বললে—বাঃ, আমি যাচ্ছি নৌকো পর্য্যন্ত—এগিয়ে দিতে।

—না, তোমার যাবার কোনো দরকার দেখছি না। তুমি এখানে বসে থাকবে সুবোধ বালকের মতো।

—জুলুম?

সেরিওজকার স্বর রুক্ষ বললে,—বসো। ইয়াকভকে বসতে হলো।···বসে সে প্রশ্ন করলে,—বসে আমাকে কি করতে হবে?

—চুপ করে বসে থাকো এক মিনিট···আমাকে চিন্তা করতে দাও

চিন্তা করে তার পর দেবো জবাব, তোমাকে কি করতে হবে। বুঝলে?

সেরিওজকার চোখে আগুনের শিখা···ইয়াকভ চুপচাপ বসলো।

মালভা আর ভাসিলি চলেছে···পার-ঘাটার দিকে···নিঃশব্দে। ভাসিলি চলেছে নিবিষ্ট মনে···গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মালভা বার-বার চাইছে ভাসিলির পানে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে ··মালভার দু-চোখে হাজার হাজার প্রশ্নের উদয়াস্ত-লীলা! নরম বালিতে দুজনেরই পা ক্রমাগত বসে বসে যাচ্ছে···দুজনকে চলতে হচ্ছে খুব ধীর মন্থর পায়ে।

অনেকখানি যাবার পর মালভা ডাকলো,—ভাসিয়া···

—কেন? বলে ভাসিলি ফিরে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে মালভার পানে তাকালো।

মালভা বললে—কোনো মতে উচ্ছৃত নিশ্বাস চেপে বললে,—ইয়াকভের সঙ্গে এ ঝগড়া আমিই বাধিয়ে ছিলুম, ইচ্ছা করে'! তুমি অনায়াসে এখানে থাকতে পারো ...ঝগড়া না করে'···

মালভার কণ্ঠ বেশ স্বচ্ছ···স্পষ্ট।

একটু থেমে থেকে ভাসিলি বললে,—ঝগড়া বাধাবার কারণ?

—কোনো কারণ নয়···এমনি···খেয়াল।

কথাটা বলে মালভা হাসলো ··মলিন হাসি।

—হুঁ···বেশ মজার খেয়াল···না? ভাসিলির চোখে বিদ্যুতের ঝলক!

মালভা নিরুত্তর···নির্ব্বাক!

ভাসিলি বললে—ছেলেটির মাথা তুমি খাবে এ আমি বেশ জানি। তুমি ওকে একেবারে উচ্ছন্ন দেবে। গাঁ থেকে এসেছে। গো-বেচারী··· কিছু জানতো না···তুমি শয়তানী রাক্ষসী....লজ্জা নেই, ধর্ম্ম নেই, ভগবান নেই···কিছু নেই তোমার!···একবার ভেবে দেখো।

···এখন আমি কি করবো, বলতে পারো? মালভার কণ্ঠ আকুল—স্বরে বেদনা···ক্ষোভ···অভিমান।

—কি করবে···তুমি? ভাসিলির বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলো যেন!

মনে হলো. প্রচণ্ড প্রহারে মালভাকে জর্জ্জরিত করে' দেয়! ওর ঐ চুলের ঝুঁটি ধরে' পায়ের নীচে ফেলে দু'পা দিয়ে ওকে চেপে পিষে থেঁৎলে দেয়! মালভার ঐ নরম নিটোল বুক···ঐ রাঙা দুটো ঠোঁট—চোখের ঐ বিলোল দৃষ্টি—পরিপুষ্ট যৌবন—সব একেবারে পিষে গুঁড়ো করে' বালির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে' দেয়! মায়াবিনী···কুহকিনী দুশ্চারিণী! দাঁতে দাঁত চেপে অনেক কষ্টে ভাসিলি নিজের দুর্জ্জয় দুর্দ্দম বাসনাকে নিরুদ্ধ রাখলো।

দূরে পিপেগুলোর পাশে বসে সেরিওজকা আর ইয়াকভ···ভাসিলি একবার চেয়ে দেখলো দুজনের পানে···ওরা এই দিকেই তাকিয়ে আছে।

হুঙ্কার তুলে ভাসিলি বললে মালভাকে—যাও, তুমি যাও আমার কাছ থেকে...চলে যাও, বলছি! এখনি!···হাত আমার নিশপিশ করছে .. এখনি হয়তো তুলে আছাড় মারবো তোমাকে।

রুক্ষ কঠিন দৃষ্টি...রূঢ় স্বর···চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা!

মালভা নির্ব্বাক, নিরুত্তর...অচল-অটল···দুচোখের অচপল দৃষ্টি ভাসিলির উপর নিবদ্ধ।

ভাসিলি বললে,—তোকে মেরে ফেলাই দরকার···উচিত। ভাড়ায় যে দেহ খাটায়, নিত্য নতুন নিয়ে যার কারবার, বেসাতি ছলা-কলার··· পেশা বেইমানী ··এ কাজের সাজা তুই পাবি একদিন ··পেতেই হবে। যাদের ধরতে তুই তোর ঐ দেহের ফাঁদ পাতিস···তাদেরই কারো হাতে

তোর অপমৃত্যু ...এ আমি বলে রাখছি !...তোর ঐ ঘাড় আর গলা, যে ঘাড়-গলায় বাহার ফুটিয়ে বেড়াস, তারাই তোর ঐ ঘাড়-গলা একদিন মোট্‌কে তোর সব দর্প চূর্ণ করে দেবে !

মালভা হাসলো...অতি করুণ হাসি। তার পর ধীর মৃদু কণ্ঠে বললে, —তোমার আর কিছু বলবার দরকার নেই, বোধ হয় ? আমি আসি... গুড বাই !

এ-কথা বলে' মালভা আর এক-তিল দাঁড়ালো না...ফিরলো।

দাঁতে দাঁত চেপে ভাসিলি গর্জ্জন তুললো—মালভা ফিরে তাকালো না। বালির উপর দিয়ে যেখানে-যেখানে পা ফেলে ভাসিলি এসেছে, সেখানে সেখানে তার ভারী বুটের দাগ...সেই দাগগুলোর উপর নজর রেখে ভাসিলির বুটের সেই দাগগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে সে ফিরে চললো...পা দিয়ে বুটের দাগগুলো ঘেঁটে মুছে নিশ্চিহ্ন করে'।

মালভা এলো সেরিওজকার কাছে। সেরিওজকা বললে—বিদায় দিয়ে এলি ?

মালভা কথা কইলো না, শুধু মাথা নেড়ে জানালো, হাঁ। তারপর অবসন্নের মতো বসলো সেরিওজকার পাশে। ইয়াকভ তার পানে ঠায় চেয়ে আছে ..মুখে হাসির আভাস। মন তাকে কত কথাই বলছে— কত রঙীন স্বপ্ন রচনা করছে...মনের কি অসহ্য তৃপ্তি তাতে !

সেরিওজকার মনে পড়লো অনেক দিন আগে শোনা একটা গান, গানের কথাগুলো ঠিক মনে পড়ছে না। সেরিওজকা বললে মালভাকে —বিদায় ওকে দিয়ে এসে মন হলো হায়, ব্যথায় ভরা !...না ?

সে কথার জবাব না দিয়ে...একটা নিশ্বাস ফেলে মালভা বললে,— চাকরি কায়েম করতে তুমি ফিশারি-অফিসে যাচ্ছো কখন শুনি ?

—আজ সন্ধ্যার সময় যাবো।

—আমি তোমার সঙ্গে যাবো···নিয়ে যাবে ?

—নিশ্চয় নিয়ে যাবো।···আমিও তাই চাইছি মালভা।

ইয়াকভ ক্ষেপে উঠলো···স্থান-কাল-পাত্র ভুলে জোর গলায় সে বললে—আমিও যাবো তাহলে!

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' সেরিওজকা বললে—কে তোমাকে যাচ্ছে নিয়ে...শুনি ?

দূরে বাজলো ফিশারীর ঘণ্টা। মালভা হলো উৎকর্ণ···উন্মনা... সেরিওজকা বললে,—নৌকো এবারে ছাড়বে তাহলে···

মালভা বললে—হুঁ···

কথাটা সে বললে যেন কোন্ সুদূর ধ্যান-লোক থেকে! ইয়াকভ বললে সেরিওজকাকে উদ্দেশ করে—মালভা আমাকে নিয়ে যাবে!

—মালভার নিমন্ত্রণ!...সেরিওজকা বললে শ্লেষ-ভরে।

—হুঁ ···মালভার নিমন্ত্রণ। ইয়াকভ দিলে জবাব।—মালভা বলেছে আমাকে যেতে।

মালভা চমকে উঠলো,···বললে.—আমি তোমাকে যেতে বলেছি! কেন? আমার দরকার ?

ইয়াকভ কি বলতে যাচ্ছিল·· বলা হলো না। বাধা দিয়ে সেরিওজকা বললে,—শোনো বৎস, আমার স্পষ্ট কথা...সাদা কথা·· আর মুখে আমি যা বলি, কাজেও তা করি।...মালভার পিছনে তুমি লাগবে না··· খবর্দ্দার, তোমাকে সাবধান করে' দিচ্ছি। ওর চারদিকে ন্যাঙলা-হ্যাঙলা কুকুরের মতো ঘুর-ঘুর করবে না। যদি করো, তোমার হাড্ডি চূর করে···দেবো।···মালভার ধার মাড়াও যদি···তাহলে তখনি তোমার

মরণ. আমার হাতে।···পোকা-মাকড়গুলোকে আমি যে-চোখে দেখি, তোমাকেও দেখি ঠিক তেমনি। বুঝলে ঐ কচি মাথায় একটি গাঁট্টা··· ব্যস...মাথার ঘিলু ছিটকে সাফ্! তোমার মতো বহু বেয়াদবকে আমি মেরে সাফ করে দিয়েছি! তোমাকে মারা···একটু টিপন!

কথার সঙ্গে সঙ্গে সেরিওজকার যে চেহারা ইয়াকভ দেখলো, তার বুক কেঁপে উঠলো···বুঝতে পারলো, লোকটা মুখে যা বলে, কাজেও তা করতে পারে এবং করে।

একটু সরে বসে ইয়াকভ বললে,—কিন্তু মালভা নিজে...

—যথেষ্ট হয়েছে! সেরিওজকা ভেংচে উঠলো, বললে,—চুপ করে থাকো।—তুমি কি ভেবেছো বলো, তো ছোকরা? কুকুর হয়ে কালিয়া পোলাও খাবার লালচ্···হাড়গোড় একটু চাটতে পেয়েছো, ভাগ্যি বলে মেনো। তার বেশী আশা আর করো না। ··কী! অমন করে' তাকিয়ে দেখছো কী?

ইয়াকভ তাকিয়ে ছিল মালভার পানে। তৃষাতুর দৃষ্টি···মালভার নীল দুটি চোখে হাসির রেখা! সে রেখা ছুরির ফলার মতো ঝিকঝিক করছে!

হেসে সেরিওজকার একখানা হাতের উপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে মালভা যে অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ইয়াকভের উপর··· ইয়াকভের সর্ব্ব-শরীর তাতে ঘেমে উঠলো।

মালভার হাত ধরে সেরিওজকা উঠে দাঁড়ালো···তারপর চললো দুজনে পাশাপাশি···ঘেঁষাঘেঁষি ভাসিলির পরিত্যক্ত চালা-ঘরটার দিকে ...মুখে হাসি আর কথার তরঙ্গ তুলে।

ইয়াকভও উঠে দাঁড়ালো···পা কিন্তু অবশ···বালিতে দু পায়ের গোড়ালি গুঁজে সে দাঁড়িয়ে রইলো হতভম্বের মতো।

অনেক দূরে মানুষের ছোট্ট মূর্ত্তি···বালি বয়ে ঐ নৌকোয় উঠছে।

সাগর বয়ে চলেছে কারো পানে দৃকপাত না করে' হাসির সফেন তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কলকূজন তুলে। বাঁদিকে বালির ধূ-ধূ প্রসার··· নৌকোর উপর সেই মনুষ্য-মূর্ত্তির পানে অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ইয়াকভ...কণ্ঠে বাষ্প জমে' উঠেছে···দু' চোখে বাষ্প। সে বাষ্পে চোখের সামনে থেকে ঐ নৌকো, নৌকোর ছোট্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি, সাগর, বালু-তট সব ঝাপশা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে!

ফিশারীতে সাড়া জেগেছে। সে সাড়া ইয়াকভের কাণে এসে লাগছে। দূর থেকে মালভার উল্লাস-হাসির রোল... পরিচিত হাস্য-রোল।

ইয়াকভের চেতনা ফিরলো...চেতনা ফিরতে বালির বুকে কিসের সন্ধান করতে লাগলো...উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো,—আমার ছুরি···বাঃ, আমার ছুরিখানা নিলে কে?

সাগরের বুকে তরঙ্গের শুভ্র সফেন উচ্ছ্বাস···সূর্য্য আরো দীপ্ত প্রখর হয়ে উঠেছে···আকাশে বাতাসে আলোর ঝর্ণা···

খুব বেশী দিনের কথা নয়। তার নাম ভাশ্‌কা···বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। সকলে তাকে লালু বলে ডাকে! লাল থেকে লালু। ভলগা নদীর ধারে এক বড় সহরের গণিকা-পল্লীতে সে চাকরি করে···বাড়ী-উলিরা চাঁদা করে তাকে মাহিনা দেয়। মাথার চুলগুলো কটা রঙের ···লালচে; আর মুখখানা চাকার মতো···মুখও টক্‌টকে লাল...দেখলে মনে হয়, যেন কশাইয়ের দোকানের টাটকা কাটা মাংস।

ঠোঁট দুটো পুরু···প্রকাণ্ড কাণ দুটো মাথার খুলি থেকে বেরিয়ে আছে হাত ধোবার বাঁটলোর দুখানা হাতা যেন! ভয়ানক মারকুটে··· যাকে তাকে মেরে বেড়ায়। ভোঁদা চেহারা···চোখ দুটো···মনে হয়, যেন এক-তাল মাংস-পিণ্ডের মধ্যে দুটো কাঁচের মার্ব্বেল কে পুঁতে রেখেছে! আঁট-সাঁট খাটো নীল রঙের কশাক-কোট গায়ে আছে সব সময়···পরণে পশমী ট্রাউজার পায়ে ঝক্‌ঝকে পালিশ করা বুট···জুতোর গায়ে পাঁচ-সাতটা ক্রীজ(···কোঁচ পড়েছে। মাথার কটা চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া—মাথায় মাঝে মাঝে একটা ক্যাপ্‌ আঁটে।

দলের লোকজন তাকে লালু বলে। যে পল্লীতে কাজ করে, সে পল্লীর মেয়েরা তাকে বলে, জহ্লাদ! লালুর হাতে নিত্য তারা যে রকম মার খায়, লালুকে দেখলে ভয়ে তারা শিউরে ওঠে!

সহরে অনেক স্কুল কলেজ। সে সব স্কুল-কলেজে কিশোর আর তরুণ বয়সের ছাত্রের খুব ভিড়। গণিকা-পল্লী এখানে আলাদা মহল্লায়। এ মহল্লার সদর রাস্তায় এবং গলিতে-খুঁজিতে সব বাড়ীগুলোই গণিকালয়। সব বাড়ীতেই ভাস্কার যাতায়াত আছে। কোনো বাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে কিম্বা বাড়ীউলির কথা কেউ যদি না শোনে, তখনি সেখানে ভাস্কার ডাক পড়ে।···বাড়ীউলি হাঁকে চোখ রাঙিয়ে—আমার জান বেরিয়ে গেল তোদের জ্বালায়··· ভাস্কাকে ডাকচি, দাঁড়া।

এই ভয় দেখানোতেই কখনো কখনো কাজ হয়। মেয়েরা ঝগড়া থামিয়ে চুপ করে; দাবী নিয়ে চ্যাঁচামেচি করেনা। তাদের দাবীও ভারী রকমের নয়···বাড়ীউলিকে বলে···ভালো একটু কিছু খেতে দাও। না হয় বলে, ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে ভেপসে উঠলুম! বাইরে একটু ঘুরে আসতে পাবো না? ভয় দেখানোতে যেক্ষেত্রে ফল হয় না···সে ক্ষেত্রে বাড়ীউলি ভাস্কাকে ডেকে আনে।

সে-ডাকে ভাস্কা আসে। মন্থর গতি···গম্ভীর মুখ···ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই যেন। ভাস্কা এসে বাড়ীউলির ঘরে ঢোকে··· ঘরের দরজায় পড়ে খিল···বাড়ীউলির সঙ্গে ভাস্কার ফিশ্‌ফাশ পরামর্শ চলে। যে মেয়ের নামে নালিশ···যাকে শায়েস্তা করতে হবে, তার নামটুকু শুধু ভাস্কাকে বলা।

বাড়ীউলির নালিশ শুনে ভাস্কা গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলে—হুঁ! তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সেই মেয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়···ভাস্কাকে দেখে সকলে একেবারে কাঠ···

তখন তাদের দেখলে কে বলবে, এদের গলায় আওয়াজ বেরোয়! থ াবার ঘরে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে ভাস্কা এসে সে ঘরের দোরে দাঁড়ায়···

সকলের পানে তাকায়···নিঃশব্দে···যেন পাথরের ষ্টাচু! মেয়েদের হাড়পাঁজরাগুলো ঝিন-ঝিন করতে থাকে। তাদের পানে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে ভাস্কা ডাকে—মাশা···শুনে যা।

মিনতিভরা কাঁদো-কাঁদো গলায় মাশা বলে—না, না, না আমার গায়ে হাত দিয়ো না ভাশিলি। সত্যি, আমি তাহলে গলায় রুমালের ফাঁশ টেনে মরবো।

—হুঁ! আয় তবে আমিই তোর গলায় ফাঁশ টানবো। ভাস্কার কথা বলার ভঙ্গী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—ভাস্কা শুধু হুকুম করে, কারো দিকে এগোয় না—সে চায়, ওরা আসবে এগিয়ে ভাস্কার কাছে সাজা নিতে!

কেঁদে ককিয়ে মেয়েরা বলে—আমি চ্যাচাবো···লোক ডাকবো··· ঘরের জানলা-কপাট ভেঙ্গে ফেলবো! আরো কী কী করবে··· মেয়েরা দেয় তার লম্বা ফিরিস্তি।

ভাস্কা বলে,—জানলা-কপাট ভাঙ্‌বি? বটে···ভাঙ্‌ না। ভাঙ্‌ সেই সার্শির কুচি তোকে খাওয়াবো না তাহলে।

যত জেদী মেয়ে হোক···রুখে সরে থাকতে পারে না···জহ্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হয় এসে। কেউ যদি না আসে, ভাস্কা আসে তার কাছে। এসে তার চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে তোলে বোঁটা ধরে লাউ-কুমড়ো তোলার মতো! এমনি তুলে ধাঁইসে দেয় ছুড়ে মেঝের উপর। সে মেয়ের সঙ্গে যাদের একটু বেশী ভাব, তাদের দিয়ে হাত-পা বাঁধিয়ে···মুখে কাপড় গুঁজিয়ে মেয়েটার মুখ বাঁধে। তারপর তাদের সামনেই চলে শাস্তি···চাবকানো কিল চড় ঘুষি...বিপর্য্যয় রকমে। যে মেয়ের সাজা হচ্ছে, সে যদি তেজী হয়, যদি মনে হয়, বেরিয়ে পুলিশে নালিশ করবে, তাহলে ভারী চামড়ার ষ্ট্রাপ দিয়ে মারে···গা না ছড়ে যায়, কেটে যায়··আর ও

রকম মারার আগে তার গায়ে ভিজে কাপড় চাপা দেয়, দাগ পড়বে না! কখনো বা লম্বা সরু থলির মধ্যে বালি কাঁকর পুরে সেই থলি দিয়ে পাছায় মারবে, তাতে দাগ পড়ে না। ব্যথা যা·· হয়, সে ব্যথা অনেক দিন থাকে। সে ব্যথায় সোজা হয়ে চলতে পারে না অন্ততঃ তিন-চার দিন।

অপরাধের গুরুত্ব অপরাধীর স্বভাব বা লালুর দরদ-মমতার উপর সাজার গুরুত্ব মোটে নির্ভর করে না। খুব তেজী মেয়েকে কখনো মারে বেদম ভাবে···ভিজে ন্যাকড়া তার গায়ে চাপানোর সম্বন্ধে হুঁশিয়ার না হয়েই। ভাস্কার পকেটে সব সময়ে মজুত আছে তে-মুখো চাবুক ওক কাঠের খাটো হ্যাণ্ডেলে আঁটা। চামড়ার চাবুক—চামড়ায় সরু তার জড়ানো। এ চাবুকের প্রলয়-ঘায়ে গায়ের চামড়া কেটে যায়! তার পর সেই কাটা ঘায়ে সরশে বাটার প্রলেপ, না হয় নুনের জলে ভিজুনো ন্যাকড়া এঁটে দেওয়া হয়···তাতে জ্বালা যা বাড়ে···সে আর বলবার নয়!

মারবার সময় ভাস্কার মুখের ভাব থাকে নির্বিকার। সে মুখে না আছে রাগ বা আক্রোশ। দরদ বা মমতার একটু চিহ্নও নয়। দু চোখের দৃষ্টি···ঠিক ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মতো।

সাজার বিধি এক রকমের নয়···সাজার নতুন-নতুন বিধি আবিষ্কারে ভাস্কার মাথা চমৎকার খেলে। এদিকে তার মাথা ভারী সাফ্।

কপতেভাব জেলার এক বাবু এসেছিল ভেরার ঘরে। তার পাঁচ হাজার রুবল চুরি গেছে! বাবুটি সাইবেরিয়ার বড় ব্যবসাদার মানুষ। সে গিয়ে পুলিশে নালিশ করলে...ভেরার ঘরে সে ছিল···ভেরার সঙ্গে আর একটা মেয়ে ছিল···সে মেয়েটার নাম সারা সার্ম্মান।···সারা ঘরে ছিল

এক ঘণ্টা। তারপর সারা চলে যায় নিজের ঘরে। সে চলে গেলে রাতটা 'বাবু' কাটিয়েছে ভেরার ঘরে···ভেরার সঙ্গে। মদ খেয়েছিল···হুঁ···বাবু যখন চলে আসে, ভেরার তখন বেশ নেশা ছিল!

এ নালিশের ফলে যা হয়···তাই হলো। পুলিশ এলো তদন্ত করতে। ভেরা সারা দুজনেই বললে, টাকার কথা তারা জানে না। তারা চুরি করেনি। পুলিশ দুজনকেই গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। কিন্তু প্রমাণ মিললো না বলে মাসখানেক পরে ভেরা সারা দুজনেই খালাশ!

থানা থেকে ভেরা সারা বাড়ীতে ফিরলো···বাড়ীতে তখন আবার নতুন করে তদারক তদন্ত! বাড়ীউলি বললে—নিশ্চয় তোরা এ টাকা চুরি করেছিস···দে আমাকে অর্দ্ধেক বখরা।

সারা প্রমাণ দিলে, চুরির ব্যাপার সে কিছু জানে না। সে প্রমাণে খুশী হয়ে বাড়ীউলি সারাকে দিলে ছেড়ে! কিন্তু ভেরা···বাড়ীউলি বললে—নিঃখুশ চুরি করেছিস। দে আমায় অর্দ্ধেক বখরা। বেচারী কাঁদলো··কেঁদে কাকুতি জানালো, সে চুরি করেনি। বাড়ীউলি রেগে আগুন! হুঁ, চুরি করিসনি ··বটে!

স্নানের ঘরে ভেরাকে রাখলো বাড়ীউলি চাবি বন্ধ করে'। লোনা দু পিশ মাছ দিলে শুধু তাকে খেতে....

তবু ভেরা বলে, সে চুরি করেনি। বাড়ীয়লি বললে,—কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, দে এখনো বলছি।

কেঁদে বাড়ীউলির পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভেরা বললে—সত্যি বলছি, আমি চুরি করিনি...আমি কিছু জানি না।···

তবু এমন গোঁ!...বাড়ীউলি ডেকে আনলো ভাস্কাকে। ভাস্কাকে বাড়ীউলি বললে—ও পাঁচ হাজার রুবল বার কর্ দিকিনি, লালু,···বার করে দিতে পারলে তা থেকে একশো রুবল তোকে দেবো।

রাত্রে ভাস্কা এলো চোরাই রুবল বার করতে। ভেরা আছে স্নানের ঘরে বন্ধ…খিদেয় আকুল পিপাসায় অধীর,…অন্ধকার ঘরে পড়ে আছে বেচারী…আশাহীন উপায়হীন।

দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো ভাস্কা!

ভাস্কা ডাকলো—ভেরা! ভেরার মুখে কথা নেই।

ভাস্কা বললে,—কোথায় রেখেছিস টাকা?

ভেরা কোনো জবাব দিলে না…ভয়ে কুঁকড়ে ভেরা গেল সরে… অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তার পর কি হলো, কিছু জানে না!

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলো ভেরার…স্নানের ঘরের দরজা খোলা · তখন শীতকাল…পরণে শুধু পাতলা সেমিজ, পায়ে জুতো নেই. ভেরা বেরুলো ঘর থেকে। হা-হা করে হেসে ভেরা বললে,—কাল আমার মার সঙ্গে আমি যাবো গির্জ্জেয়…হা হা হা ··

ভেরা পাগল হয়ে গেছে! সারা কেঁদে উঠলো। সে বললে বাড়ীউলিকে ডেকে—টাকা! টাকা আমি চুরি করেছি! ভেরা চুরির কিছু জানে না।

মেয়েরা ভাস্কাকে ঘৃণা করে, না, ভয় করে…বলা শক্ত। ভাস্কা সুনজরে দেখবে ··তার জন্য তাদের কী প্রাণপণ প্রয়াস।…ভাস্কা কারো ঘরে এসে রাত্রিবাস করে যদি, সে ভাবে, তার বরাত জোর! অথচ দালালদের তুষ্ট করতে কারো আলস্য বা ঔদাস্য নেই এতটুকুন।

বাবু আসে, তাদের তোয়াজ করবে। গুণ্ডা আসে, তাদের সব রকমে খুশী করা চাই। খুশী করে তাদের বলে,—পারো লালুকে একটু শিক্ষা দিতে? তারা বলে,—বাপরে…ওর সঙ্গে কে লাগবে?

লালু মদ ছোঁয় না। গায়ে ভয়ানক জোর আর কী বেপরোয়া।· এদের অনেকের ঘরে লালু এসেছে রাতের অতিথি হয়ে।

আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া দাওয়া চলেছে। যাদের বুকের পাটার জোর লালুর খাবারের সঙ্গে চায়ের পেয়ালায় বীয়ারের গেলাসে তারা আর্শেনিকের গুঁড়ো মিশিয়ে দেছে। তবু কিছু হয়নি! অমর যেন। সে ধাক্কা কাটিয়ে লালু সুস্থ হয়ে উঠেছে! লালু জানে, তাকে এড়িয়ে থাকতেই চায় সকলে। লালু তাই মাঝে মাঝে বলে, —আমি বুঝিরে, বাগে পেলে আমায় তোরা দাঁতে কেটে টুকরো টুকরো করবি…করে খুশী হবি। কিন্তু সে আশা দুরাশা রে! বাগে আমায় কখনো পাবিনে আমি সব সময় হুশিয়ার!

এ-কথা বলে ঠোঁট দুটো উল্‌টে ভাস্কা এমন তাচ্ছল্যের হাসি হাসে!

পুলিশ আর গুণ্ডা বদমায়েসদের সঙ্গে লালুর ভয়ানক দহরম মহরম। ডিটেকটিভ অফিসারদের সঙ্গে আরো বেশী ভাব। তারা চায় বিনা পয়সায় গণিকা-বিলাস! সে কাজে লালু তাদের মস্ত সহায়। —অমুক মেয়েটা, লালু ··লালু দেয় জবাব, তার আর কি! আজই রাত্রে আমি ব্যবস্থা করে রাখবো।

এরা ছাড়া ভাস্কার আর বন্ধু নেই—কোথাও না, কেউ না। সকলের সঙ্গে ঝগড়া। কেউ তাকে দেখতে পারে না। এলে তার সঙ্গে মিশতে হয়, বসতে হয়, কথাও কইতে হয়। কাজ কি শয়তানকে চটিয়ে। লালু তাদের সঙ্গে বসে, বীয়ার খায় আর সারা সহরে কোথায় কি হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস বর্ণনা করে। সারা সহরের যত নোংরামি লালুর নখদর্পণে ··বড় বড় জ্ঞানী গুণী মানুষের নাড়ী-নক্ষত্র তার আর জানতে কিছু বাকী নেই।

চাঁদার মাহিনা হলেও বাড়ীউলির ওখানে মাহিনার উপর আরো বেশী কিছু পায়। বিনা পয়সায় পায় থাকবার ঘর আর দু-বেলার অন্ন। বাড়ীউলির সঙ্গে অনেক দিনের কারবার। এ বাড়ীতে দর্শনী হলো দিনের

বেলা তিন রুবল, রাত্রে পাঁচ। বাড়ীউলির নাম ফেকলা ইয়ারমোলোভনা মোটা শরীর। বয়স পঞ্চাশ বছর…ফন্দীবাজ। ভাস্কাকে সে ভয়ানক ভয় করে। ভাস্কাকে চাঁদার উপর নগদ আরো কিছু সে দেয়…মাসে পনেরো রুবল করে। বারান্দার গায়ে ছোট্ট একটা কামরায় থাকে ভাস্কা… ভাস্কা এ বাড়ীতে থাকে। এখানে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি নেই, চ্যাঁচামেচি বা গোলমাল নেই। এ বাড়ীতে ছুকরি আছে এগারোজন। সকলেই বেশ শান্ত নিরীহ।

ফেকলার মেজাজ ভালো থাকলে ছুকরিদের বাবুদের সঙ্গে সে বসে গল্প করে…সুখ দুঃখের গল্প, ছুকরীদের কত সুখ্যাতি করে। বলে—এমন মেয়ে আর কোনো বাড়ীতে পাবেন না মশাইরা…যেমন দেখতে শুনতে তেমনি কারো কোনো রোগ নেই…বয়সও কাঁচা। সব চেয়ে যে ডাগর, তার বয়স ছাব্বিশ বছর...তার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পাবেন না কিন্তু। তবে…হ্যাঁ, দিব্যি আঁট সাঁট গড়ন…দেহ যেন মাখন · তেমনি নরম।…এমন মেয়ে এ তল্লাটে পাবেন না। আমি ডাকছি…দেখুন তাকে চক্ষে।

ফেকলা ডাকলো...কায়ুশকা...

কায়ুশকা এলো…যেন পুরুষ্টু হাঁস! বাবুর চোখে পলক পড়ে না! চোখে লালসার দীপ জ্বেলে দেখছে…হুঁ...থাশা চেহারা! দেখে পছন্দ হলো।

কায়ুশকা বেঁটে নয়…খুব ঢ্যাঙাও নয়..দেহে মাষ আছে, শাঁস আছে। বাঁধন বেশ টাইট…মুখ বুক চমৎকার…ঠোঁট দুটি পাতলা…যেন আঙুর…রসে টশ্‌টশ করছে। চোখে ভাব নেই, ভাষা নেই…পুতুলের আঁকা চোখের মতো। চোখের দৃষ্টি...ও দৃষ্টি যেন একটি কথা জানে শুধু…যেন বলছে, এসো…

কায়ুশকা বলে, তার আসল নাম হলো আকসিনিয়া কালুজিনা। তার বাড়ী রিয়াজানায়···মডকা বলে একটা ছেলে ···গা ঘেঁষে এসে আলাপ করতো···এটা সেটা জিনিষ দিত। তার সঙ্গে···শেষে একটা ছেলে হয়ে পড়লো। ছেলেটা রইলো না। বাড়ীতে ঠাঁই হলো না আর। চাকরির জোগাড় করেছিল। এক আবগারী অফিসারের পরিবারের অফিসারের বৌয়ের ছেলে হয়েছিল····বৌয়ের দুধ ছিল না...তাকে তারা নিলে ছেলের দুধ-মার চাকরিতে। তাদের সঙ্গে সহরে আসে। দু চার মাস পরে তাদের সে ছেলেটা মরে গেল। তারা কিন্তু কায়ুশকাকে ছাড়লো না···রাখলো তাদের কাছে। বাড়ীর কাজ করতো···ঝীয়ের মতো। সেখানে চাকরি করেছে চার বছর।

তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো, এ-কাজ ভালো লাগছে? মন্দ কি! কায়ুশকা দেয় জবাব। বলে, দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছি, পরতে পাচ্ছি···পায়ে এক জোড়া করে জুতোও মেলে। তাছাড়া থাকবার ঘর! শুধু একটু শান্তি—পাবার জো নেই! ঐ জহ্লাদ ভাস্কা হতভাগা ..যে-মার মারে।

—কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ আছে তো এখানে!

—আমোদ-আহ্লাদ। কোথায়? আমি তো চক্ষেও দেখলুম না কোনোদিন।

মাতালের মাতলামি চীৎকার চ্যাঁচামেচি···কী নয়! যে বাড়ীউলি, তার নাড়ীনক্ষত্র থেকে কোন্ ঘরের কোনখানটায় ফাট ধরেছে, কোন্ দেয়ালের কতখানি বালি খশে গেছে, কোন জানলায় ছিটকিনি নেই ·· বাড়ীতে কখন কি হবে, সব জানে কায়ুশকা! নতুন কিছু যদি থাকে! কথাগুলো বলে কায়ুশকা হাসে। বাড়ীতে আর যে সব মেয়ে

আছে, তাদের মধ্যে কায়ুশকা শুধু বোকা। কথাবার্ত্তা, হাবভাব··· মানুষের মতো নয়। যেন জানোয়ার!

সব বাড়ীর মেয়েদের মতো এ বাড়ীর মেয়েরাও বাবু এলে তাদের সঙ্গে মদ খেয়ে মনের কপাট খুলে দেয়। ভাস্কার কথা খুলে বলে—এমন গুণ্ডা বদমায়েস···মেরে একেবারে গা গতর ভেঙ্গে দেয়!

কেঁদে বাবুদের কাছে নালিশ জানায়। কিন্তু বাবুরা কি তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা শুনতে আসে? তারা আসে দেহের ক্ষুধা মেটাতে। তাদের নালিশ প্রতিকারের চিন্তাও কারো মনে উদয় হয় না। মদের নেশায় তারা চীৎকার করে, ভাস্কাকে গাল দেয়, শাপ দেয়, ভাস্কা শোনে। শুনে বারান্দার কোণের কামরা থেকে ভাস্কা আসে—এসে তাদের ঘরের দরজা ঠেলে চোখ রাঙিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলে,—চুপ কর্! চ্যাঁচাবি নে! খবর্দ্দার। তারা বলে, চ্যাঁচাবে না? হতভাগা রাক্ষস আমার চোখের কোণে কালসিটে পড়িয়ে দিছিস! আমার এ আঙুলটা ভেঙ্গে দিছিস একেবারে দেবো না তোকে গাল!···চাবুক মারবি ছপছপ···গা কেটে ফুলে ওঠে, আর তোর পূজো করবো, বটে!

—হু তবু চ্যাঁচাবি। নেশা করেছিস, পড়ে ঘুমো। না হলে হাড় কখানা আস্ত রাখবো না বুঝলি।

এইরকম আলাপ। কারো মুখে ভাস্কা একটা ভালো কথা শোনে না কখনো। ভাস্কার সঙ্গে কারো রাত্রিবাস কথনো বাদ যায়নি। যখনি যার উপর খেয়াল হবে—না বলবে, এমন সাধ্য কারো নেই। কারো উপর খেয়াল হলে ভাস্কা এসে স্পষ্ট ভাষায় বলে, আজ রাত্রে তোর কাছে থাকবো।

তারপর নিজের লালসা মিটলেই নিঃশব্দে ভাস্কা আসে বেরিয়ে। মেয়েরা বলে,—ছুঁচো পাজী শয়তান! পাথর দিয়ে ভগবান তোকে তৈরী করেছে।

এ বাড়ীর সকলের সঙ্গে পালা করে তার রাত্রি বাস। আকসিনিয়াও বাদ যায় না। একবার আকসিনিয়ার উপর কী ঝোঁক হ্লো, উপরি উপরি পাঁচ রাত্রি! শেষের রাত্রে আকসিনিয়ার সঙ্গে কিসের খিটিমিটি, আকসিনিয়াকে ধরে' এমন করে দিলে পিটিয়ে যে গায়ের ব্যথায় তিন দিন তিন রাত্রি আকসিনিয়া বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না!

আকশিনিয়ার স্বাস্থ্য ভালো, দেহ মজবুত; কিন্তু ভারী কুঁড়ে, ...ঘুমোতে পেলে আর কিছু চায় না! আর কী ঘুমই সে ঘুমোতে পারে! ঘুমোলে নাক যা ডাকে, মনে হয়...যেন বাঘ, না, সিঙ্গী ডাকছে! সন্ধ্যা হলে সদরে গিয়ে সকলের সঙ্গে বসতে হয়...রঙ মেখে, সাজগোজ করে' বাবু-ধরা টোপ হয়ে। এমনি বসে থাকতে থাকতে কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছে!...পাশের মেয়েরা প্রথমে হাসে, তারপর দেয় সবলে ধাক্কা ঘুম ভাঙ্গাতে। ঘুম যদি ভাঙ্গে তো ভালো! নাহলে নাক ডাকার শব্দে আর সকলে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের ঘরে বাবুরা আসে...আকশিনিয়া তখনো বসে বসে ঘুমোচ্ছে! আর তার নাক ডাকছে যেন সিংহনাদ। হো-হো করে সকলে হাসতে থাকে! কী জোর হাসি! সে-হাসিতেও আকশিনিয়ার ঘুম ভাঙ্গে না কিন্তু।

এমন প্রায় হয়। এই ঘুমের জন্য বাড়ীউলি তাকে যা-খুশী মুখে আসে, গালাগাল দেয়। বলে, সর্ব্বনাশী! এমন করে নিজের আখের নষ্ট করছিস! এ কি কাল-ঘুম তোর,...এ্যাঁ! গালাগালে-বকুনিতে ঘুম যখন ভাঙ্গে না·· তখন বাড়ীউলি মারে চড়...চড়ের পর চড়। চড় খেয়ে আকশিনিয়ার ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম ভেঙ্গে খানিকটা এ্যাঁ-এ্যাঁ করে কাঁদে...তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।...

এবারে ঘুম ভাঙ্গাতে লালুর ডাক পড়ে : লালু এসে হাজির হয়।

লালু ডাকে—এই আকশিয়ানা…

আকশিয়ানার ঘুম ভাঙ্গে। জড়োসড়ো মূর্ত্তি—আকশিয়ানা বলে—মারবি আমায় ?…মার' ?…

—হুঁ ! ভাস্কা গম্ভীর কণ্ঠে দেয় জবাব।

আকশিয়ানাকে পাঁজাকোলা করে লালু আনে খাবার ঘরের দোরে …এনে নামিয়ে দেয়…নামিয়ে দিয়ে ভাস্কা বলে—কাপড়-চোপড় খুলে ফ্যাল…

কাপড় খুলতেই হয়। খুলতে খুলতে মিনতি-ভরা কণ্ঠে আকশিয়ানা বলে,—খুব জোরে মারিস নে লালু…আমি মরে যাবো…মুখে বলে আর গায়ের আবরণ খোলে।

সব ফেলে দেয় আকশিয়ানা…গায়ে থাকে শুধু সেমিজ…লালু হাঁকে —সেমিজ খোল্…

—ওরে বাবারে…তুই মানুষ নোস ··রাক্ষস ! বলতে বলতে সেমিজটাও খুলে ফেলে আকশিয়ানা।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের উপর সজোরে পড়ে ভাস্কার হাতের ষ্ট্রাপ।

চীৎকার করে কেঁদে ওঠে আকশিয়ানা…

ভাস্কা বলে,—এখানে নয়, উঠোনে আয়।

হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে ভাস্কা নিয়ে আসে উঠোনে। সে কাঁপছে…কাঁদো কাঁদো গলায় আকশিয়ানা বলে,—ওরে মারিস নে…

শীতকাল…কন্‌কন্ করছে চারিদিক…হিঁচড়ে টেনে আকশিয়ানাকে লালু এনে উঠোনে ফেলে…উঠোনে বরফ পড়েছে—পা দিয়ে ঠেলে আকশিয়ানাকে ভাস্কা বলে,—বরফের উপর শো…শো, বলছি।…

কী কাকুতিভরা আকশিয়ানার দৃষ্টি…ভাস্কা বলে,—বল্ কি বলবি ?

মুখখানা ভাস্কা গুঁজড়ে ধরে জমাট বরফের উপর...চীৎকার করলে কেউ শুনতে পাবে না। বরফের উপর মুখ গুঁজড়ে ফেলে ভাস্কা চালায় তার সর্ব্বাঙ্গে ঐ ষ্ট্রাপ! সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলে,—ঘুমো, ঘুমো, ঘুমো, কত ঘুমোবি ঘুমো।

ভাস্কা যখন ছেড়ে দেয়, তখন কেঁদে কেঁদে আকশিয়ানার গলা গেছে ভেঙ্গে। ছাড়া পাবা মাত্র আকশিয়ানা উঠে দাঁড়ায়···দাঁড়িয়ে মুখখানা খিঁচিয়ে ভাস্কাকে বলে,—তোর হয়েছে কি! এমন দিন চিরকাল থাকবে না...আসবে, তোর দিন আসবে একদিন। তোকেও এমনি কাঁদতে হবে। মাথার উপর ভগবান আছেন!

ভাস্কা জবাব দেয় তাচ্ছল্য-ভরে—বক্‌বক্ করবি, কর্, যত খুশী কর্···এর পর আর একবার ঘুমো···উঠোনে ন্যাংটো করে ফেলে গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে তোকে সপাসপ চাবুক মারবো।

জীবনে মানুষ শিক্ষা পায়···নানাভাবে। এক শিক্ষা দেয় দৈব··· যাকে বলে, এ্যাক্‌সিডেন্ট। শিক্ষায় মানুষ কখনো সুফল পায়, কখনো এ শিক্ষা চরম রকমের পাওনা চুকিয়ে দেয়! সূর্য্য কিরণ দেয়···সে কিরণে আমরা ছায়াও পাই। ভালো-মন্দ নিয়ে জীবন! মানুষ যে-কোনো কাজই করুক..তার ফল আছে। মানুষকে তার কর্ম্মফল ভোগ করতেই হবে...এর ব্যতিক্রম কোনো কালে ঘটে না।

ভাস্কাকেও একদিন তার কাজের ফল ভোগ করতে হলো।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা সাজসজ্জা করে সকলে খাবার ঘরে এসে বসেছে খাওয়া সেরে···এখনি সদরে গিয়ে বসতে হবে—একটি মেয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে বললে,— ঐ ভাস্কা এসেছে।

মেয়েদের বুকগুলো ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

লিডা বললে,—আয়, আয়, দেখে যা···বেহেড্ মাতাল একেবারে··· সঙ্গে পুলিশ !

কথা শুনে আর সকলে ছুটলো জানলার ধারে ।

লিডা বললে,—ও কি ! চলতে পারছে না। পুলিশ ওকে ডুলি থেকে ধরে নামাচ্ছে...কি মজা !

আনন্দে লিডা হাততালি দিলে উঠলো, – নিশ্চয় এ্যাকসিডেণ্ট।

ডুলিওয়ালা আর পুলিশ দুজনে ধরাধরি করে ভাস্কাকে নিয়ে এলো বাড়ীতে। মেয়েরা ছুটলো দেখতে। ভাস্কা নির্দ্দয় মার মেরেছে সকলকে সকলে ওকে দেখে আজ তেমনি খুশী !

ভাস্কার লাল মুখখানা পাণ্ডাশ···ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে—কপালে ঘাম।

বাড়ীউলি ছুটে এলো—তার চোখ দুটো এত বড়। বাড়ীউলি বললে,—ব্যাপার কি ভাসিলি ?

অসহায়ের মত মাথা নেড়ে ভাস্কা বললে,— পড়ে গেছি।

পুলিশ বললে,—ট্রলি থেকে পড়ে গেছে···চাকায় পা গেছলো আটকে। হাড় ভেঙ্গে গেছে।

মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে.···কারো মুখে কথা নেই। সকলে ধরাধরি করে ভাস্কাকে দোতলায় তার ঘরে নিয়ে এলো। এনে বিছানায় শুইয়ে দিলে। ডাক্তারের কাছে লোক ছুটলো। মেয়েরা দাঁড়িয়ে ভাস্কার বিছানার পাশে···মুখে কথা নেই। শুধু পরস্পরে চাইছে পরস্পরের পানে।

ভাস্কা দেখলো। দেখে গর্জ্জন তুললো,—ভাগ্ সব এখান থেকে।

কেউ নড়লো না।

ভাস্কা বললে,—ভারী সব মজা পেয়েছিস···না ?

লিডা বললে,—কান্না আসছে না···কাঁদবো কি করে ?

ভাস্কা তাকালো বাড়ীউলির পানে···বললে—এদের তাড়া এখান থেকে এই বাড়ীউলি! মজা দেখতে এসেছে সব ..এ্যাঁ।

লিডা বললে,—ভয় করছে লালু।

বাড়ীউলি বললে,—যা রে তোরা এখান থেকে।

মেয়েরা চলে গেল। যাবার সময় সকলে লালুর দিকে যে-চোখে চেয়ে গেল, সে চাওয়া মারাত্মক। লিডা শুধু বলে গেল—আবার আসবো।

আকশিনিয়া নড়েনি। ভাস্কা তাকালো তার পানে।

আকশিনিয়া বললে,—যেমন শয়তান, ঠিক হয়েছে! জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে ন্যাংচাবি! বেশ হয়েছে!

আকশিনিয়া চিরদিন ভয়ে কেঁপেছে ভাস্কার সামনে—আজ তার ভয় নেই।

একতলায় মেয়েদের জটলা। সকলের পুঞ্জিত আক্রোশ···শয়তানের সাজা দেছেন ভগবান! আঃ! এত আনন্দ জীবনে তারা পায়নি কোনো দিন। ভাস্কা আজ আর সাপ হয়ে ছোবল দিতে পারবে না। জীবনে আর কখনো নয়। এখন ও আর সাপ নেই···সাপের নির্বিষ খোলশখানা! বাড়ীউলিকেও সকলে বেশ দু চার কথা দিলে শুনিয়ে। ওকে আর কিসের ভয়!

বাড়ীউলিও খুশী হয়নি, এমন নয়। সেও খুব খুশী! কি জুলুম না চিরদিন করেছে! কত টাকা মাসে মাসে ওর হাতে গুঁজতে হয়! তা ছাড়া ওর পিছনে কত খরচ হয়েছে! ওকে না হলে বাড়ীর মেয়েগুলোকে টিট্ রাখা যায় না! তাদের শায়েস্তা করতে পারে শুধু ঐ ভাস্কা। তা হোক, তবু বাড়ীউলিও কম ভয় করতো ভাস্কাকে!

ডাক্তার এলেন···ভাস্কাকে দেখলেন। তার ভাঙ্গা পা খানাকে টেনেটুনে কাঠ বাঁধলেন, তার উপরে ব্যাণ্ডেজ জড়ালেন। ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা করলেন, করে বাড়ীউলিকে বললেন,—রুগীকে বাড়ীতে রাখা ভয়ানক ব্যাপার,—বাড়ীউলি। ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। এখানে কে ওকে দেখবে? তার উপর চিকিৎসার খরচ!

ডাক্তার চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে লিডা অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললে,—কি গো মেয়েরা, একবার আমাদের প্রাণের জন রুগীকে দেখতে যাবে না?

—নিশ্চয়! তারা প্রায় সমস্বরে জবাব দিলে।

তারপর সুড় সুড় করে উঠলো দোতলায় হাসতে হাসতে···মজার তামাসা দেখতে চলেছে যেন!

ভাস্কা তার বিছানায় পড়ে আছে চোখ বুজে। মেয়েরা এসে দাঁড়াতে চোখ খুললো। দেখে বেশ শান্ত সহজ ভাবেই বললে,—আবার তোরা এসেছিস্!

—তোমার জন্য দুঃখে বুক আমাদের ফেটে যাচ্ছে, ভাসিলি! আহা, তোমাকে আমরা কতখানি ভালোবাসি বলো তো ভাস্কা!

—মনে নেই, আমাদের তুমি চিরদিন কী আদর করেছো!

তাদের স্বর বেশ সহজ। কথায় অনেকখানি দরদের ভঙ্গী···সকলে দাঁড়িয়েছে ভাস্কার বিছানা ঘিরে। ভাস্কার উপর দৃষ্টি···আক্রোশ আর আনন্দে ভরা। ভাস্কাও চেয়ে আছে তাদের পানে, ভাস্কার দৃষ্টিতে গভীর হতাশা···অসহায় নিরুপায়তা ভেদ করে জ্বলছে আক্রোশের আগুন! নিশ্বাস ফেলে ভাস্কা ভাবলো, হাতী হাপোরে পড়েছে আজ...

এ আক্রোশ চেপে রাখতে পারলো না। ভাস্কা বলে উঠলো—শুনছিস, আমি এখনি উঠবো।

—আহা, তাই ওঠো গো। দোহাই তোমার! জয় ভগবান বলে ওঠো, সত্যি!

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভাস্কা মনের আক্রোশ চাপলো।

মেয়েদের মধ্যে একজন বললে—কোন্ চরণখানিতে চোট লাগলো প্রাণেশ্বর?

কথাটা বললে বটে···বলেই কিন্তু মুখ তার আতঙ্কে নীল! হেসে তখনি বললে,— এই চরণখানি···না?

কথাটা বলে ভাস্কার সেই ব্যাণ্ডেজ-জড়ানো পা-খানা সে দিল নেড়ে।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভাস্কা তুললো আর্ত্তনাদ,—উঃ বাবারে! বাঁ হাতেও বেশ জখম। নাড়তে পারলো না। ডান পাখানা সজোরে ছুড়লো ভাস্কা... লাথিটা যদি লাগে মেয়েটার গায়ে! লাগলো না—রাগে ভাস্কা নিজের চেয়ারে মারলো জোরে এক চড়।

মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়লো।

ভাস্কা চেঁচিয়ে উঠলো—চলে যা, চলে যা পোড়ারমুখীরা! না গেলে তোদের আমি খুন করবো।

সে কথা কে শোনে! হাত ধরাধরি করে তারা নাচ স্থরু করে দিলে ভাস্কার বিছানা ঘিরে। নাচতে নাচতে কেউ কাটে ভাস্কার গায়ে চিমটি...কেউ মারে ঠেলা, কেউ দেয় তার গায়ে থুতু...কেউ দেয় তার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পাখানা নেড়ে। তাদের চোখ যেন জ্বলছে, হাসির আলোয়! হা-হা করে হাসছে, চ্যাচাচ্ছে, চীৎকার করছে। অজানা অচেনা মানুষ দেখলে কুকুরগুলো যেমন চ্যাচায়, তেমনি চ্যাচাচ্ছে। এত দিনে তাদের গায়ের জ্বালা মিটেছে! ভগবান খুব শোধ দেছেন! এ আনন্দ দেখলে মনে হয়, ওরা যেন ক্ষেপে গেছে!

ভাস্কা চেঁচিয়ে উঠলো—বাড়ীউলি এলো ছুটে। চীৎকার করে

বাড়ীউলি বললে,—খুব খুব খুব হয়েছে! এখন সরে পড়,·· না হলে আমি পুলিশ ডাকবো। জ্যান্ত মানুষটাকে তোরা মেরে ফেলবিরে! আহাহা আহাহা···

বাড়ীউলি এলো বিছানার কাছে এগিয়ে। মেয়েদের বয়ে গেছে বাড়ীউলির কথা শুনতে! অনেক শুনেছে—ঐ ভাস্কার ভয়ে শুনেছে! আজ আর সে ভয় কারো নেই।

হঠাৎ এ নাচ হাসি চীৎকার থামলো একজনের মিনতিতে। মিনতিভরে আকশিনিয়া বললে সকলকে উদ্দেশ করে,—আর কেন? যথেষ্ট হয়েছে! একটু দয়া কর্ সকলে। বেচারা বেশ জখম হয়েছে। ওর ব্যথা কতখানি, একবার বোঝ্·· আর কেন? লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনরে সব।

আকশিনিয়ার দু-হাত কৃপা-প্রার্থিনীর মতো অঞ্জলিবদ্ধ। মেয়েরা নিঃশব্দে গেল ঘর থেকে বেরিয়ে।

বিছানায় ভাস্কা পড়ে আছে নিঃশব্দ নিস্পন্দ! গায়ের সার্টটা ফেঁশে ছিঁড়ে গেছে···চওড়া বুক সে বুকে ক্যাটকেটে লাল মোটা উলের মতো লোম। ভাস্কার শ্বাসপ্রশ্বাস ঢেউয়ের মতো উঠছে নামছে। দু' চোখ বুজে পড়ে আছে ভাস্কা···গলার ঘড়র-ঘড়র করে শব্দ হচ্ছে।

মেয়েরা দরজার বাহিরে বারান্দায়...লিডা সকলের আগে। লিডা বললে,—যদি মরে যায় ভাস্কা?

এ' কথা শুনে সকলে ভয়ে কাঁটা!

মেয়েরা আর দাঁড়ালো না···ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে সকলে চলে গেল। ঘরে আকশিনিয়া একা···নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে এলো ভাস্কার খুব কাছে

জিজ্ঞাসা করলে,—কি করবো বল তো ভাস্কা ? কিসে একটু আরাম পাস তুই ?

চোখ খুললো ভাস্কা আকশিনিয়ার পানে তাকালো···কোনো কথা বললে না।

কণ্ঠে দরদ ভরে আকশিনিয়া বললে,—কথা ক। সকলকে তাড়িয়ে দিয়েছি। একটু কাৎ করে দেবো ? বড্ড ঘাম হয়েছে·· ধুলো নোংরা। আরাম হবে। কিন্তু তার আগে একটু জল দেবো, খাবি ? জল আনি, কেমন ?

ভাস্কা নিঃশব্দে মাথা নাড়লো·· তার ঠোঁট নড়লো...কোনো কথা বললে না !

—হুঁ, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে। বুঝেছি। আকশিনিয়া বললে বিগলিত কণ্ঠে,—ওদের অন্যায় ! মানুষের এমন বিপদ ! তাকে নিয়ে হাসি-তামাসা ? কোথায় লাগছে ভাস্কা ? বল্ না, একটু হাত বুলিয়ে দি, কিম্বা একটু সেঁক-তাপ···

ভাস্কার মুখে জবাব নেই। আকশিনিয়া বললে,—সদ্য চোট···কষ্ট খুব হবে। সহ্য করা ছাড়া উপায় যখন নেই, সেঁক দিই, ..কোনো কষ্ট থাকবে না।

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে ভাস্কা বললে,—আমি জানি। যাতনায় ভাস্কার কপালে কোঁচ···মৃদু কণ্ঠে ভাস্কা বললে,—জল খাবো।

আকশিনিয়া তখনি ভাস্কার মুখে ধরলো জলের গ্লাস।

আকশিনিয়া রয়ে গেল দোতলায় ভাস্কার কাছে। শুধু খাওয়া দাওয়া করতে নামে। অন্য মেয়েরা আকশিনিয়ার সঙ্গে কথা কয় না...কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না। বাড়ীউলিও আকশিনিয়াকে বারণ করে না

যে, কেন তুই ওকে নিয়ে নিজের রোজগার খোয়াচ্ছিস! দিন-রাত সে আছে ভাস্কাকে নিয়ে। তার সেবা করছে, শুশ্রূষা করছে।

সন্ধ্যার পর বাবুরা আসে, আকশিনিয়া তাদের পানে তাকায় না। তাদের জন্য আকশিনিয়া এতটুকুন কেয়ার করে না। ভাস্কা ঘুমোয়, সে বসে জানলার ধারে..বাহিরের পানে তাকিয়ে সে দেখে পাশের বাড়ীর ছাদে জমাট বরফ ··গাছপালায় কুচো বরফ জমে আছে। বাড়ী ঘরের ছাদ ফুঁড়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। আকাশ সে ধোঁয়ায় কালো কদাকার হয়ে যাচ্ছে। বাহিরের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ·· যখন ক্লান্তিতে ভারী হয়ে ওঠে, চেয়ারে বসে আকশিনিয়া ঘুমে ঢুলে পড়ে হাতে মাথার ভর রেখে। রাত্রে সে ঘুমোয় ভাস্কার খাটের পাশে খালি মেঝেয়!

ভাস্কার সঙ্গে আকশিনিয়ার কথা হয় দু'-একটা কচিৎ কখনো। ভাস্কা চায় জল, এটা-ওটা···আকশিনিয়া তখনি এনে দেয়। ভাস্কার পানে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকে। তারপর আবার বসে জানলার ধারে।

এমনি করে চার দিন কাটলো। বাড়ীউলি ঘর-বার করছে, · ভাস্কাকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্য। কতকাল ভুগবে···অনর্থক তার একটা কামরা থাকে জোড়া ঐ হতভাগার জন্য!

একদিন সন্ধ্যার সময়···ভাস্কার ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে, ভাস্কা মাথা তুললো...ডাকলো,—আকশিনিয়া আছিস?

চেয়ারে বসে আকশিনিয়া ঢুলছিল—ভাস্কার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে ভাস্কার কাছে এলো···জিজ্ঞাসা করলে,—কি চাই?

—চেয়ার নিয়ে আমার কাছে বোস।

নিশ্বাস ফেলে আকশিনিয়া একখানা চেয়ার আনলো টেনে—সেই চেয়ারে বসলো, বললে,—বল্, কি বলবি।

—কিছু না…এমনি। শুধু কাছে একটু বসে থাক।

দেয়ালের গায়ে পেরেকে টাঙানো ভাস্কার রূপোর বড় ঘড়ি…কাঁটা গুলো হু-হু করে চলে সময়কে দিচ্ছে এগিয়ে…রাস্তা দিয়ে একখানা শ্লেজ গাড়ী চলেছে—চাকায় কি ক্যাঁচক্যাচ আওয়াজ তুলে! নীচে একতলায় মেয়েগুলোর হা-হা হাসির উচ্ছ্বাস ..ওদের মধ্যে একটা মেয়ে চেঁচিয়ে গান গাইছে…

ক্ষুধাতুর এক ছাত্র এলো—
মনটা আমার নিয়ে গেল
নিয়ে গেল রে—

ভাস্কা ডাকলো—আকশিনিয়া…

—কেন ?

—আর তোকে মারবো না। এবারে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো।

আকশিনিয়া দিলে জবাব,—এক ঘরেই তো দুজনে রয়েছি আমরা।

—হ্যাৎ,এ রকম নয়। দাঁড়া না, সেরে উঠি—তারপর বেশ মানুষের মতো…

—আচ্ছা।

—খুব ভালো হবো—দুজনে বেশ থাকবো।

ভাস্কা আবার চুপ করলো। চোখ বুজে চুপচাপ রইলো অনেকক্ষণ তারপর বললে—এ বাড়ীতে নয়। এখান থেকে আমরা চলে যাবো। নতুন করে আমরা ঘর বাঁধবো—কেমন ?

—কোথায় যেতে চাস্ ? আকশিনিয়া করলে প্রশ্ন।

—অন্য কোনোখানে। আমার এই জখমের জন্য ট্রলি কোম্পানির নামে আমি আদালতে মকর্দ্দমা করবো। ড্যামেজ পাবো। দিতে তারা

বাধ্য। আইন। তা' ছাড়া কিছু টাকাও আমি জমিয়েছি—একশো রুবল!

—কত? ভুরু কুঁচকে আকশিনিয়া করলে প্রশ্ন।

—প্রায় একশো রুবল।

—সত্যি? আকশিনিয়ার দু চোখ এত বড় হলো!

—হ্যাঁ। সে টাকায় তুই স্বচ্ছন্দে একখানা বাড়ী তৈরী করতে পারবি তোর নিজের। তারপর কোম্পানির নামে মকর্দ্দমা করে কম টাকা খেশারতী পাবো না। আমরা যাবো সিমবির্স্‌কে—কিম্বা সামারায়। সেখানে বাড়ী কিনবো। সেখানকার সেরা বাড়ী।…ভালো ভালো ছুকরী জোগাড় করবো…পাঁচ রুবল করে নেবো তাদের জন্য দর্শনী। তুই হবি বাড়ীউলি…

হেসে আকশিয়ানা বললে—কি যে বলিস ভাস্কা!

—কেন হবে না বল্? তুই দেখে নিস, আমি বাজে কথা বলি না।

—বেশ, বেশ।

—তোকে আমি বিয়ে করবো আকশিনিয়া। কথাটা সে বললে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে।

—কী? সবিস্ময় দৃষ্টিতে ভাস্কার পানে চেয়ে আকশিয়ানা করলে প্রশ্ন।

—তোকে আমি বিয়ে করবো আকশিয়ানা।

—ও! বেশ, বেশ!

আকশিয়ানা হো-হো করে হেসে উঠলো চেয়ারে পিঠ ঠেশিয়ে চেয়ারখানা দুলোতে দুলোতে । সে হাসি আর তার থামে না!

ভাস্কা বললে—মর্, হাসচিস যে! হলো কী?

আকশিয়ানা বললে,—তোর বিয়ের কথা শুনে হাসছি। আমাদের

নাকি আবার বিয়ে হয় ? তিন তিন বছর গির্জ্জের ধার মাড়াইনি। পাগল হয়েছিস তুই ! আমি হবো তোর বিয়ে-করা বৌ ? তারপর পেটে ধরবো তোর ছেলেপিলে ! হা-হা-হা-হা…

ছেলে-মেয়ের কথা মনে হতে আবার হাসির দমক। ভাস্কা তার পানে চেয়ে আছে নিঃশব্দে।

আকশিয়ানা বললে,—তুই ভাবিস, তুই তু করে ডাকলেই আমি তোর সঙ্গে চলে যাবো ? কী যে বলিস। নিজের কোটে পেয়ে আমাকে তুই আস্ত রাখবি তাহলে ! তুই কী মানুষ, তা আর কারো জানতে বাকী নেই !

এ কথা ভাস্কার ভালো লাগলো না। একটু ধমক দিয়ে ভাস্কা বললে —চুপ কর এখন।

কে শোনে সে কথা। আকশিয়ানার মুখের আগল গেছে খুলে সে… বকতে লাগলো পুরোনো কাহিনী। ধমক দিয়ে ভাস্কা আবার বললে —তুই চুপ করবি ?

আকশিয়ানা তবু বকে। ভাস্কা বললে,—চুপ কর রে…আমি হাত জোড় করচি।

আকশিয়ানা চুপ করলো।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় দুজনে আর কোনো কথা নয়। রাত্রে ভাস্কা বিকারের ঘোরে ভুল বকতে লাগলো। চীৎকার…হুঙ্কার… দাঁতে দাঁত ঘষে ডান হাত তুলে তড়পানি ! নিজের বুকে চড়ের পর চড় মারে।

আকশিয়ানার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভয়ে ভয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো ভাস্কার পানে, তারপর তাকে ঠেলা দিয়া বললে,—ভাস্কা

ভাস্কা তোর হলো কি হঠাৎ? ভয় পেয়েছিস? স্বপ্ন দেখেছিস···খারাপ স্বপ্ন?

শীর্ণ কণ্ঠে ভাস্কা বললে,—স্বপ্ন দেখছিলুম। আমায় জল দে, খাবো।

আকশিয়ানা জল দিলো। জল খেয়ে ভাস্কা বললে,—না রে, বাড়ী নিয়ে ছুকরী পুষবো না। আমি দোকান করবো···সে-ই ভালো বাড়ীতে। কি বলিস?

আকশিয়ানা বললে,—দোকান! হুঁ! দোকানই ভালো।

—তুই আসবি আমার সঙ্গে? কি বলিস্!

—সত্যি তুই আমাকে চাস ভাস্কা? চালাকি নয়!

—নারে, সত্যি! যে দিব্যি করতে বলিস, করবো।

মাথা নেড়ে বেশ দৃঢ় কণ্ঠে আকশিয়ানা বললে,—আমি তোর সঙ্গে যাবো না...কোথাও না।

—আমি যদি যাই, তোকে আসতেই হবে।

—ইস, আমি যাবো না।

—তুই যা ভাবছিস, তা নয়। আমি যদি...

—না, না, না···আমি কিছুতেই যাবো না ..

—যাবি না? রাগে ভাস্কার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! কিন্তু সে রাগ চেপে ভাস্কা বললে,—আমার জন্য এত কেন তোর মাথাব্যথা তাহলে শুনি? সব সময় আমার কাছে আছিস! আমার সেবা করছিস। এত দরদ! আর তুই···

— আমার খুশী, তাই এ সব করছি। তা বলে তোর সঙ্গে ঘর করবো! বাবাঃ মনে করলে অজ্ঞান হয়ে যাই। তুই তো মানুষ নোস, শয়তান।

—শয়তান! শয়তানের তুই কি জানিস? তুই নিরেট বোকা।

তোকে আমি মাথায় করে রাখবো। বলচি, কোনো ভয় নেই। বল্ যাবি আমার সঙ্গে ?

—না। আমি যাবো না। তুই আমাকে সোনার সিংহাসন দিলেও আমি যাবো না।

এ কথা বলে দু'চোখে বিরক্তি বর্ষণ করে আকশিয়ানা অনেকখানি দূরে সরে গিয়ে বসলো।

দুজনে আবার চুপচাপ। জানলা দিয়ে খানিকটা জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে। ভাস্কার মুখে একটু যেন আলোর আভা! চোখ বুজে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাস্কা পড়ে রইলো। একবার চোখ খুললো…তখনো আকশিয়ানা দূরে বসে আছে। আবার চোখ বুজলো। নীচে চলেছে নাচ গান হাসি।

একটু পরে আকশিনিয়ার নাক-ডাকা সুরু। ঘুমিয়ে সে কাদা। ভাস্কা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললো।

দুদিন পরে বাড়ীউলি খুশী হয়ে বাড়ী ফিরলো…হাসপাতালে একটা রেড এ্যাদ্দিনে খালি পেয়েছে। আঃ!

আম্বুলান্স এলো। আম্বুলান্সের সঙ্গে ডাক্তারের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আর হাসপাতালের একজন কুলি। ভাস্কাকে এখনি হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ধরাধরি করে তারা ভাস্কাকে আনলো এক তলায় খাবার ঘরে। ভাস্কা দেখলো, ঘরের দোরে বাড়ীর যত ছুকরি দাঁড়িয়ে। তার বুকখানা ধ্বক করে উঠলো! ভাস্কা কোনো কথা বললে না। ছুকরীরা তার পানে চেয়ে …কারো চোখে কৌতুক…কারো কৌতূহল…কারো বা দুঃখ!

সে চাহনি থেকে ভাস্কা বুঝতে পারলো না, ভাস্কার উপর তাদের মনের কি ভাব। আকশিয়ানা আর বাড়ীউলি দুজনে মিলে ভাস্কার গায়ে কোট পরিয়ে দিলে বাড়ীশুদ্ধ কারো মুখে কথা নেই। জমাট স্তব্ধতা।

ভাস্কা তাকালো ছুকরীদের পানে, নিশ্বাস ফেলে বললে,—আসি।

ছুকরীদের মধ্যে কে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো, ভাস্কা দেখলো না।

লিডা বললে,—গুডবাই ভাসিলি মিরোনোভিচ্।

—গুডবাই। ...ভাস্কা নিশ্বাস চাপতে পারলো না।

ভাস্কার বগলের মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে ডাক্তারের এ্যাসিষ্টাণ্ট আর হাসপাতালের কুলি ভাস্কাকে তুললো বেঞ্চ থেকে। তুলে ঘরের দরজায় এলো। ছুকরীদের পানে চেয়ে ভাস্কা আর একবার বললে,—গুডবাই। তোদের উপর আমি....

হু তিনজন বলে উঠলো,—গুডবাই ভাসিলি...

মাথা নেড়ে ভাস্কা বললে,—কী দরকার আর? আমায় সকলে মাপ করিস। ভগবানের দোহাই, তোদের গাল-মন্দি অভিশাপ...

আকশিয়ানা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো পাগলের মতো—ওকে নিয়ে যাচ্ছে? সত্যি! আমার যে ও সর্ব্বস্ব গো।

এ কথা বলে আকশিয়ানা মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো। ভাস্কা চমকে উঠলো...মাথা ফেরালো। চোখে কেমন সব ঝাপশা ঠেকছে, হু কাণ খাড়া। ভাস্কা শুনলো আকশিয়ানার আর্ত্ত চীৎকার।

ভাস্কা ভাবলো, মেয়েটা কী পাগল! কী বোকা!

ভুরু কুঁচকে ডাক্তারের এ্যাসিষ্টাণ্ট বলে উঠলো,—আঃ। নাও, নাও, চটপট করো। ভাস্কা বললে বেশ উচ্চ কণ্ঠে—গুডবাই...আকশিয়ানা, হাসপাতালে আসিস আমায় দেখতে।

সে কথা আকশিয়ানার কাণে গেল না। সে চীৎকার করে কাঁদছে, আমাকে কে দেখবে গো-ও-ও!

ছুকরীরা আকশিয়ানাকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলে অবাক! আকশিয়ানার হু' চোখে জলের ধারা।

আকশিয়ানার দিকে চেয়ে লিডা বেশ চড়া গলায় বললে,—কী মড়া-কান্না কাঁদচিস। ও তো মরেনি এখনো। হাসপাতালে ওকে দেখতে যাস্ না বাপু,...কালই তো যেতে পারিস....